KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৬ নং বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : 8/1 8/2 8/3 8/4-5 8/6	Year of Publication : শ্রাবণ ১৩২৮ ভাদ্র ১৩২৮ আশ্বিন ১৩২৮ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৮ পৌষ ১৩২৮
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সহকারী সম্পাদক—শ্রী সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পৌষ, ১৩২৮।

ভারতের শিক্ষার আদর্শ*

—:*:—

১০ম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

অতএব আমাদের জাতীয় শিক্ষা-নিকেতনগুলিকে বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়-শাসিত স্কুল কলেজ থেকে স্বতন্ত্র এবং অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠান রূপেই গঠন করতে হবে। আদালত, জেল, পুলিস, পাগলা গারদ ইত্যাদি সভ্যতার আগড়ম্ বাগড়ম্ যে সব অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান আছে এই স্কুল কলেজগুলি তাদেরই সামিল হয়ে যেমন আছে তেম্‌নি থাক।

যদি আমাদের দেশের ফল এবং ছায়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলে তাকে ইট সুরকির প্রাসাদ থেকে নেমে ধূলিতে আস্‌তেই হবে। বৈদিক যুগের তপোবনে ঋষি আচার্য্যদের চারদিকে যে বিদ্যার্থিরা সমবেত হত আমরা তাদেরই মত আমাদের জীবনী-শক্তিকে একান্ত সরলতার মধ্যে পোষণ করব একথা আমাদের সাহসের সঙ্গে বল্‌তেই হবে।

ইহার নামকরণের সম্বন্ধেও আমাদের সাবধান হতে হবে; কেননা "বিশ্ব-বিদ্যালয়" এই নামের উল্লেখ মাত্রেই আমাদের মনে অন্যান্য দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুকরণ কর্‌বার ইচ্ছা স্বতঃই জাগ্রত হয়ে উঠে।

*রবীন্দ্রনাথের The centre of Indian culture নামক গ্রন্থের অনুবাদ।

আমার মতে আমাদের দেশের কোনও একস্থানে এমন একটী কেন্দ্রাভিমুখ শক্তির প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন কাল এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে আমাদের শিক্ষার উপকরণ সম্ভার স্বতঃই আকর্ষিত ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে ভারত সভ্যতার একটী সজীব মণ্ডল সৃষ্টি করে তুল্‌বে।

১১শ পরিচ্ছেদ।

—:※:—

এলাহাবাদের একটী ইংরাজি বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রকে একবার নদীর কি লক্ষণ তা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সে তার ঠিক উত্তর দিয়েছিল; কিন্তু তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল সে কখনও নদী দেখেছে কি না তখন গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলের উপকণ্ঠস্থিত প্রয়াগের অধিবাসী হয়েও সে বালক উত্তর করল "না।" সেই বালকের মনে নিশ্চয় এমনি একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মে ছিল যে তার এই পরিচিত জগৎ কখনই তার ভূগোলের জগৎ হতে পারে না। তার পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ খবর সে নিশ্চয় পেয়েছিল যে ভূগোলের মধ্যে তার দেশেরও স্থান আছে এবং তার দেশেও নদী আছে। কিন্তু মনে করুন এ খবর অনেক দিন পর্য্যন্ত সে পেলে না—তারপর হঠাৎ একদিন একজন বিদেশী পরিব্রাজক এসে যদি তাকে বলে যে তার দেশ খুব বড়—হিমালয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত এবং গঙ্গা, যমুনা এবং সিন্ধু পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম নদী

তখন এই অভিজ্ঞতার আঘাতে তার মনের ওজন বিপর্য্যস্ত না হয়ে থাক্‌তে পারে না এবং সে এতদিন যে আত্মগ্লানি বহন করে আস্‌ছিল ছিল তারই প্রতিক্রিয়া বশে সে তখন তীব্র স্বরে একথাই ঘোষণা করতে থাকে যে অপর সকল দেশই তুচ্ছ; একমাত্র তার দেশই স্বর্গ, জগতের সম্বন্ধে তার পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণা অজ্ঞতাবশতঃই ভ্রান্ত কিন্তু তার এই অভিনব ধারণা তার চেয়েও হেয়—এ যেমনি মিথ্যা তেমনি হাস্যকর।

ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের আচরণও ঠিক এইরূপ দাঁড়িয়েছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এর কোনও আসন না থাকায় আমরা স্বীকার করে নিই ভারতের শিক্ষা বলে কিছু ছিল না এবং যা ছিল তা নাম মাত্র। তারপর যখনই কোনও বিদেশী পণ্ডিতের মুখ থেকে এর প্রশংসার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই তখনই আমরা আর আত্মসম্বরণ করতে পারি না চিৎকারে গগন বিদীর্ণ করে তার স্বরে এই কথাই প্রচার করতে থাকি যে আর সমস্ত সভ্যতাই মর্ত্তের কেবল আমাদের সভ্যতাই দিব্য এবং ব্রহ্মার বিশেষ সৃষ্টি। এই থেকে আমাদের মনে আত্ম-শ্লাঘার পিপাসা উৎকট হয়ে পড়ে—তখন কাজ করতে গেলেই বাহবার প্রয়োজন হয়।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে বিধাতার বিশেষ সৃষ্টির ধারণার যুগ অতীত হয়েছে—কেহ বা কিছু যে বিধাতার বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র এ-মত বর্ব্বরযুগেরই উপযোগী। আমরা বর্ত্তমান যুগে একথা বুঝেছি যে যে-সত্য বিশেষত্বের মধ্যে আবদ্ধ তা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন বলে কোনও মতেই সত্য হতে পারে না। যে বন্দী নির্জ্জন অবরোধে বদ্ধ সেই বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। যারা

বলেন যে বিধাতা ভারতবর্ষকে জ্ঞানরাজ্যে এইরূপ নির্জ্জন অবরোধে রুদ্ধ করে রেখেছেন তারা এর অগৌরবই করে থাকেন।

যাই হোক যদি আমাদের ভারতে শিক্ষার একটি কেন্দ্রস্থল সৃষ্টি করাই সংকল্প হয় তাহলে এই বিশ্বাস মনে রেখেই আমাদের সে কাজ আরম্ভ করতে হবে যে ভারতের সভ্যতার মধ্যে এমন কিছু আছে যা বিশ্বের সভায় উপস্থিত করবার যোগ্য।

আমি বেশ বুঝতে পারছি এইখানে আমাদের দেশের কেহ কেহ বলবেন "এত শীঘ্র না।" ভারত-সভ্যতা বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কিনা এবং তাকে আমাদের শিক্ষার মধ্যে সম্মানের আসন দেওয়া বিধেয় হতে পারে কিনা সেটা প্রথমে ভাল করে বুঝে দেখবার তাঁরা পরামর্শ দেবেন।

সৌভাগ্যবশতঃ বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র শ্রেষ্ঠতমের একাধিপত্যের উৎপীড়ন কেহই সইতে পারে না। এখানে ভালর সংখ্যা নাই এবং তাদের প্রকার ভেদেরও অন্ত নাই। এই বিচিত্র ভাল পরস্পরের সঙ্গে এখানে পরস্পরে মিলিত হয়েই আছে। অতএব কোনটা শ্রেষ্ঠতম এ নিয়ে বিবাদ করায় কোনও লাভ নাই।

আমাদের সভ্যতার মধ্যে যে অনেক অন্ধ সংস্কার এবং অনেক ত্রুটি আছে এ অতি সহজেই দেখান যেতে পারে। আমাদের সভ্যতা আজ গতিহীন হয়েছে বলেই তার এই সব ত্রুটিও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ইউরোপীয় সভ্যতাতেও এই অন্ধ সংস্কার আছে। এর রাষ্ট্রনীতি এবং বিজ্ঞান অন্ধ সংস্কারে পরিপূর্ণ; তবে ইউরোপীয় সভ্যতা গতিশীল এবং সফল বলেই এই সব সংস্কারের প্রায়ই পরিবর্ত্তন এবং সংশোধন হয়। তার ফলে এই সব সংস্কার তত

ক্ষতিকর হতে পারে না। ইউরোপীয় জাতিভেদ পরিবর্ত্তনশীল এবং প্রথার মধ্যে বদ্ধ নয় বলেই সে যেমন তত পীড়াদায়ক নয় তার সভ্যতার অন্তর্গত সংস্কারগুলিও ঠিক সেইরূপ।

মাত্র কয়েক বৎসর হল ইউরোপ "জীবনার্থ বিরোধ" এই দুটী মাত্র বৈজ্ঞানিক শব্দের কোয়াশার মধ্য দিয়েই সমস্ত বিশ্বকে দেখতে আরম্ভ করেছিল। এরই রক্তে তার দৃষ্টি রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল এবং এরই প্রেরণা অনুযায়ী সে তার গতিপথ স্থির করেছিল। আমরাও সুবোধ ছাত্রের মত তাদের কাছ থেকে এই শব্দযুগল গ্রহণ করেছি—এদের অবিশ্বাস করা কিম্বা না জানাকে আমরা শিক্ষা-হীনতার চিহ্ন বলে বিবেচনা করে থাকি। কিন্তু ইউরোপে এখন এই মতের পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মিলিবার শক্তি এবং সহানুভূতিই যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের আদি একথা ক্রমশঃ ইউরোপ উপলব্ধি করছে। উনবিংশ শতাব্দীতে উচ্ছৃঙ্খল প্রতিযোগিতাই অর্থশাস্ত্রের একমাত্র বিধান ছিল। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে এই প্রতিযোগিতা সহযোগিতায় পরিবর্ত্তিত হয়েছে। এই থেকে ইহাই প্রমাণ হচ্ছে যে যা' কিছু গতিকে প্রতিহত করে তাহাই অমঙ্গল এবং ক্ষতিকর।

এমন একটা সময় ছিল যখন আমরাও জীবন-সমস্যার আলোচনা করতাম। তখন আমরা স্বাধীন ভাবেই পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা করতাম। তখন আমরা আমাদের সেই সব পরীক্ষা থেকে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তা ইউরোপীয় সিদ্ধান্ত থেকে স্বতন্ত্র বলে তাদের উপেক্ষা করলে চলবে না। বিশ্বের হাটে এখন তাদের চালাতেই হবে। বিশ্বমানবের আবিষ্কারের শোভাযাত্রায় তাদের

যোগ দিতেই হবে। তাদের পিছু পড়ে থাকলে চলবে না। তারা যদি আত্মম্ভরিতার অচলায়তনের মধ্যে অপরকে বিস্মৃত হয়ে নিজের ঔদ্ধত্যের মধ্যে বসে থাকে তাহলে তারাও বিশ্বমানবের অবজ্ঞার বিষয় হয়ে শেষে বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে যাবে। বিশ্বের যাত্রাপথে জীবনের ক্ষেত্রে সকলের মধ্যে তাদের অবতীর্ণ হতেই হবে।

---

১২ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

দীর্ঘকাল ধরে আমরা আমাদের সভ্যতাকে দেশীয় সংস্কৃত পাঠশালের মধ্যে এক ঘরে করে রেখেছি। অথবা অবজ্ঞা থেকে যেমন অস্পৃশ্যতার উদ্ভব হয় অযথা ভক্তিও তেম্‌নি ভক্তির পাত্রকে অস্পৃশ্য করে তুলে। জাপানে এমন একটা সময় ছিল যখন মর্য্যাদার আতিশয্যে মিকাদো তার প্রাসাদের মধ্যেই বন্দী হয়ে বাস করত। তার ফলে তখন সুগনই (Shogun) রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যখন প্রকৃত পক্ষে শাসন করা মিকাদোর দরকার হল তখন তাকে তার অবরোধ থেকে সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে বের হতে হয়েছিল। আমাদের সংস্কৃত পাঠশালার সভ্যতাও ঠিক এই ভাবে আপনার সীমার মধ্যে বদ্ধ হয়ে বিশ্বের আর সব সভ্যতাকে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করে করে একান্তই কুণো হয়ে পড়েছিল। ব্রহ্মার মুখ, শিবের জটা কিম্বা এমনি কোনও একটা অলৌকিক যোনি থেকে এই সভ্যতার উদ্ভব

হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। কাজেই এ সভ্যতা সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার না হয়ে থাকতে পারে না এবং পাছে সাধারণের সংস্পর্শে শুচিতা নষ্ট হয় এই ভয়ে নিষেধের প্রাচীর তুলে একে একান্ত স্বতন্ত্র করে রাখতে হয়েছে। এইভাবে এ আমাদের দেশে ঠিক মিকাদোর অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে; আর বিদেশী সভ্যতার এই মর্য্যাদার বালাই না থাকায় অবারিত চলাচলের দ্বারা মানুষের সঙ্গে সামান্য ভাবে মেলামেশা করে আজ সে shogun এর মতই আমাদের দেশে একাধিপত্য বিস্তার করেছে। আমরা দেশীয় সভ্যতাকে ভক্তি করি বটে; কিন্তু এই বিদেশী সভ্যতা আমাদের কান মোলে রাজস্ব আদায় করে। আমরা গোপনে গোপনে এই বিদেশী সভ্যতার অপবাদ করি এর কাছে দাসখত লিখতে হয় বলে আমরা আক্ষেপ করি পীড়িত হই; কিন্তু যখন এর দরবারে আমাদের ছেলেদের প্রেরণ করি তখন এর শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত মিটিয়ে দিতে আমরা আমাদের স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করতে এবং পৈতৃক সম্পত্তিকে বাঁধা দিতে কুণ্ঠিত হই না।

আমাদের দেশীয় সভ্যতাকে এই অতিভক্তির সোনার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করে রাখলে চলবে না। এমন যুগ এসেছে যখন সব কৃত্রিম বেড়া ভাঙ্গতে সুরু হয়েছে। বিশ্বের সহিত যার সামঞ্জস্য আজ এ যুগে তাহাই থাকবে—বিশ্ব-ব্যাপিকতাই এ যুগের ধর্ম্ম; আর যা' কিছু বিশ্বের বাহিরে বিশেষত্বের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে তাকে বিধ্বস্ত হতেই হবে। শিশুকে স্বতন্ত্র লালন প্রকোষ্ঠে নিরাপদ দোলায় রাখাই বিধেয়; কিন্তু সে বয়োপ্রাপ্ত হলেও তাকে যদি সেই নির্জ্জন স্থানে রাখা হয় তাহলে তার দেহ ও মন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।

এমন একটা সময় ছিল যখন চীন, পারস্য, মিশর, গ্রীস্ এবং রোম তাদের নিজ নিজ সভ্যতাকে নিজেদের বিশেষত্বের মধ্যে স্বতন্ত্র করে পালন করতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কম বেশী পরিমাণে ভূমার যে অংশ ছিল তা' তাদের এই বিশেষত্বের রক্ষা-কবচের মধ্যে থেকে কালক্রমে প্রবল হয়ে উঠেছে। এখন সহকারীতা এবং সহযোগিতার যুগ এসেছে। তাদের বিশেষত্বের বেষ্টনের মধ্যে যে বীজ ফেলা হয়েছিল এখন তাকে বিশ্বের মুক্ত ক্ষেত্রে তুলে বসাতে হবে। সর্ব্বোচ্চ দাম পাবার তরে তাদের বিশ্বের হাটের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে।

অতএব যেখানে বিশ্বের যাবতীয় সভ্যতা সমভাবে সম্মিলিত হতে পারে এমন একটী সম্মিলন-ক্ষেত্র আমাদের প্রস্তুত করতে হবে। সেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে গ্রহণ করবে এবং প্রত্যেককে দিবে। সেখানে পরস্পরের ইতিহাসগত অবস্থার মধ্যে দিয়ে পরস্পরকে বুঝতে হবে এইরূপ তুলনামূলক বিচারের দ্বারা জ্ঞানের সমাধান এবং বুদ্ধির এই সহযোগিতাই আগামী যুগের জীবন-সঙ্গীতের প্রধান সুর হবে। আমরা আমাদের ঘরের কাল্পনিক নিরাপদ কোণ থেকে—এই শুচিবাইকে সোহাগ করে আলিঙ্গন করে থাকতে পারি; কিন্তু ভূমা আমাদের ঘরের কোণের চেয়ে ঢের বড়—সে যেদিন একে আক্রমণ করবে সে-দিন একে হার মানতেই হবে এবং ক্রমে পিছু হটে হটে নিজের প্রাচীরকে নিজেই চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে।

বিশ্বের সভ্যতার তুলনার ক্ষেত্রে দাঁড়াবার যোগ্য হতে হলে প্রথমে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সাধনার ফলকে সমবেত করে

আমাদের নিজেদের ঘরকে গড়ে তুলতে হবে; তা না হলে আমরা বিশ্ব সভ্যতার সঙ্গে বাস্তবিক ভাবে যোগ দিতে পারব না। যখন আমরা আমাদের এই মিলিত শক্তির কেন্দ্র থেকে পশ্চিমের দিকে তাকাব তখন পশ্চিমের অতিশয় আলোক আমাদের দৃষ্টিকে আর অভীভূত করবে না—তখন আমাদের দৃষ্টির ভীরুতা ঘুচে যাবে—তখন আমাদের মাথা উন্নত থাকবে—তাকে আর অপমান স্পর্শ করতে পারবে না। তখন আমরা আমাদের নিজেদের আলোকেই সত্যকে গ্রহণ করব—আমাদের যেখানে সুবিধা সেইখান থেকেই তাকে দেখব—এই ভাবে বিশ্বে জ্ঞানের যে বীথিকা সৃষ্ট হবে তাকে সবাই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বরণ করে নেবে।

১৩শ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সকল সভ্য দেশেই তাদের মানসিক জীবনের এক একটী সজীব কেন্দ্র আছে। সেখানে শিক্ষার উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হয় সেখানের মানুষের মন আনন্দের আকর্ষণে আপনি আকৃষ্ট হয়—সেখানেই তাদের মূল্য নিরূপিত হয় এবং সেখানেই তারা দেশের সভ্যতার ভাণ্ডারে নিজ নিজ অর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত হয়। এই ভাবে দেশের একটী সাধারণ বেদীতে তারা জ্ঞানের যে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করে তারই পবিত্র শিখা চারদিকে বিকীর্ণ হয়ে, দেশকে আলোকিত করে তুলে।

গ্রীসের ছিল এথেন্স, ইটালীর ছিল রোম্ এবং বর্ত্তমান ফরাসী দেশের এইরূপ কেন্দ্র হচ্ছে প্যারিস্। কাশী আমাদের সংস্কৃত বৈদগ্ধ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল এবং এখনও আছে; কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের সভ্যতার যা' উপাদান তা' একমাত্র সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে নাই।

অনেকে বলে থাকেন এবং আমারও যদি স্বীকার করে নিই যে ইউরোপীয় সভ্যতাই বর্ত্তমান যুগের পক্ষে একমাত্র উপযোগী সভ্যতা তাহলে এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে আসে যে ভারতে কি এই সভ্যতার কোনও কেন্দ্রস্থল আছে? ভারতের জীবনের সঙ্গে কি এর কোনও চিরন্তন সজীব যোগ আছে? তার উত্তর এই যে শুধু যে এ নাই তা' নয় এ কখনও হতে পারে না। ইউরোপীয় সভ্যতার নিত্যকার কেন্দ্র ইউরোপ ব্যতীত অপর কোথাও হতে পারে না। অতএব আমাদের চিত্তকে যদি এই ইউরোপীয় সভ্যতা থেকে আলোক গ্রহণ করতেই হবে একথা স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে আমাদিগকে প্রভাতের তরে এমন কোনও নক্ষত্রের উপর নির্ভর করতে হবে যা দূরবর্ত্তী কোনও এক অজ্ঞাত পৃথিবীর পক্ষে সূর্য্য। এই নক্ষত্র থেকে আমরা আলোক পেতে পারি—কিন্তু এ থেকে কখনও দিনের উদ্ভব হবে না। এ থেকে আমরা আবিষ্কারের পথরেখা নির্ণয় করতে পারি কিন্তু এ কখনই সম্পূর্ণ সত্যকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবে না। প্রকৃত পক্ষে এই নক্ষত্রের আলোকে আমাদের অন্তরতম প্রদেশের মধ্যে সেই অমৃতরসের সঞ্চার করতে পারে না যা থেকে আমাদের জীবন বর্ণে, গন্ধে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে।

এই কারণেই ইউরোপীয় শিক্ষা আমাদের পক্ষে পুঁথিগত হয়ে আছে—তা থেকে বৈদগ্ধ্যের উদ্ভব হয় নি। এ ঠিক দেশলাই

পেটিকার মত—এতে অনেক কাজ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু এ সেই প্রভাতের আলোক নয় যাতে প্রয়োজন এবং সৌন্দর্য্য এবং জীবনের বিচিত্র রসধারা সংহত হয়ে থাকে।

এই কারণেই ভারতের অন্তরতম আত্মা এখানে একটী শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্যোগে আজ আমাদের ডাক দিয়েছেন—সেইখানে তার ভারতীয় মানসিক শক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমবেত হবে—সেইখানে তার প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান ও ভাবের সঞ্চয় এক পরিপূর্ণ সমন্বয়ের মধ্যে মিলিত হবে। জনকের সময়ে মিথিলা যেমন ছিল—বিক্রমাদিত্যের সময় উজ্জয়িনী যেমন সে আজ সেইরূপ একটী ব্রহ্মবর্ত্তের তরে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সে আজ তার নিজের চিত্তকে বিশ্বমানবের কাছে নিবেদন করে বিশ্বের অগ্রসরগতির সহায়তা করবার সুযোগ সন্ধান করছে। তার বিক্ষিপ্ত শক্তির বিশৃঙ্খলা এবং তার ধার করা সঞ্চয়ের জড়তার হাত থেকে করে সে মুক্ত হবে সে আজ সেই দিনের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে।

১৪শ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

শুধু বিদেশী বলে কোনও সভ্যতার উপরই যে আমার অশ্রদ্ধা নাই—একথা এখানে উল্লেখ করা দরকার বিবেচনা করি। বরঞ্চ চিত্তকে সজীব রাখবার তরে এরূপ শক্তির সংঘর্ষের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলেই আমার বিশ্বাস। একথা স্বীকার করতেই হবে যে

খৃশ্চান ধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতার বিরোধী শুধু তাই নয় তারা এমন কি ইউরোপের প্রকৃতির সঙ্গেও খাপ খায় না। তথাপি এই বিরোধী ভাবের আন্দোলন ইউরোপের স্বাভাবিক চিত্ত-প্রবাহের সংঘর্ষে এসে তার গতিকে যে ক্রমশঃ অগ্রসর করেছে এবং তাকে যে অনেক নূতন নূতন সম্পদ দান করেছে এ কথাও স্বীকার করতে হবে। বাস্তবিক পক্ষে বিদেশী ভাবের সংঘাত থেকেই ইউরোপের সাহিত্য সজীব এবং সফল হয়ে উঠেছে। ভারতেও ঠিক সেই একই ব্যাপার ঘটছে। ইউরোপের সভ্যতা শুধু যে তার জ্ঞানের সঞ্চয় নিয়ে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে তা' নয়—সে তার গতিশীলতাকেও আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করছে। যদিও একে এখনও আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনার করে উঠতে পারি নাই—তার ফলে যদিও আমাদের পদে পদে স্খলন হচ্ছে—তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে যে এ আমাদের মানসিক রীতি নীতির প্রতিবাদ করে আমাদের চিত্তকে প্রথাগত অভ্যাসের জড়তা থেকে মুক্ত করছে।

যে কৃত্রিম ব্যবস্থার ফলে আজ এই বিদেশী সভ্যতার হাতে আমাদের সমগ্র চিত্ত বিকিয়ে গেছে যে ব্যবস্থা নব নব সত্যের সমবায়ে আমাদের দেশে নব ভাব শক্তির সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু তারই বিরুদ্ধে আমার আপত্তি। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের নিজেদের সভ্যতার সমুদায় উপাদানগুলিকে প্রবল করে তুলবার জন্য আমার আগ্রহ—আমাদের সভ্যতা যখন প্রবল হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবকে ঠেকাতে পারবে তখনই আমরা তাকে যথাযথরূপে গ্রহণ করতে পারব—তখন আমরা তাকে সম্পদরূপেই

লাভ করব—সে আর ভার হয়ে আমাদের পীড়িত করবে না। তখন আমরা তাকে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত্ব করতে পারব তখন আর তার বাহির মহলে শুধু পাঠ্য পুস্তকের কাঠ কেটে এবং পুঁথিগত বিদ্যার জল বয়ে জীবন ক্ষোয়াব না।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যরতন প্রামাণিক।

যুগল-পত্র

—:০:—

Wilmersdorfer Strasse 79.
Bei Reichard,
Berlin.
23rd October, 1921.

প্রীতি নমস্কার — * * *

* * * *

আপনাকে এই সমস্ত ভূমিকা শোনাবার উদ্দেশ্য আপনাকে সুবিধে পেয়ে একচোট লেক্‌চার দিয়ে নেওয়া নয়, এর উদ্দেশ্য আপনাকে এই কথাটি জানান যে (আপনি ও আমি খুব সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ অসম পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও) আপনার লেখার মধ্যে যে মূল সুরটা বাজে তার সঙ্গে আমার খুব বেশী মেলে বলে আমি স্বতঃই তাতে একটু খুসি হয়ে থাকি। আপনার লেখার মধ্যে যে জীবনীশক্তির স্পন্দন আছে সেটার স্পর্শটা আমার বড্ড ভাল লাগে, তবে দুই একটা বিষয়ে আপনাকে আমি একটু সমালোচনা কর্ব্ব। সেটা পরে। ধরুন আপনি আপনার "শূদ্র আত্মা" প্রবন্ধে যে সব কথা লিখেছেন তার মধ্যে একটা refreshing চিন্তার ধারার পরিচয় পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি। আপনি যে ভাবে জীবনে বিশ্বাস করেন আমি ঠিক সেভাবে জীবনে বিশ্বাস না কর্লেও সব চেয়ে

বড় কথা—অর্থাৎ আমার viewpoint থেকে—হচ্ছে এই যে আপনি জীবনে বিশ্বাস করেন। আপনার মধ্যে যে optimism আছে সেটা দুঃখকে অস্বীকার করে গায়ের জোরে optimism প্রচার করা নয়, কারণ আপনি আমাদের বর্ত্তমান জীবনের স্রোতহীনতাটা অনুভব করে ব্যথা বোধ করেন। এই ব্যথা বোধ করাটা অনেক সময়ে যে কোনও ধারেই বলুন সৃষ্টির কাজে বাধা দেয়, আংশিক নিরাশা আনে কিন্তু সেই সৃষ্টি কর্ত্তে হবে বলে সত্য দুঃখকে অস্বীকার করা চলে না। এ সব কথা আপনি বোঝেন এবং এ সব বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার খুব মেলে। নইলে যদি আপনি বল্‌তেন জগতে দুঃখ কষ্ট সবই আমাদের সৃষ্ট সবেরই ঔষধ আমাদের হাতে, নিছক্ optimismই একমাত্র সত্য তাহলে সেটা ঠিক্ optimism হত না, কারণ সত্যের ঊর্ম্মির পুনঃপুনঃ আঘাতে তা দুদিনেই চুরমার হয়ে যেত। কোথায় পড়েছিলাম এরকম optimism নরকঙ্কালের মুখে হাসির মতন। উপমাটা আমার ভাল লেগেছিল। Hardy জিনিষটি খুব মনে প্রাণে অনুভব করেছেন কিন্তু তিনি জীবনে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু জীবনে বিশ্বাস না কর্লে জীবন নিয়ে অগ্রসর হওয়াবই বা দরকার কি, আর নানারকম চিন্তাকে মূর্ত্ত করে তোলারই বা সার্থকতা কি? যাঁরাই জগতের অসংখ্য দৈনিক ছোট বড় tragedy অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন তাঁরাই কমবেশী দুঃখবাদী হয়ে পড়েন কারণ না হয়েই পারেন না, কিন্তু কেবল এই দুঃখকেই বড় করে দেখাটায় মন perspective হারিয়ে বসে। তাই দুঃখকে স্বীকার করেও জীবনে বিশ্বাস করাটা শুধু যে ভাল তাই নয়, তা ভিন্ন গতিই নেই। এ সব বিষয়ে আপনার মনোভাব আপনি

আপনার প্রবন্ধাদিতে বেশ সুন্দর ফুটিয়ে উঠিয়েছেন। কিন্তু যে সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমার একটু গরমিল হয় সেটা হচ্ছে আপনি বাস্তব সুখকে বোধহয় একটু বেশী বড় বলে মনে কচ্ছেন। আমার বোধহয় আপনি যদি একবার য়ুরোপটা স্বচক্ষে দেখে যেতেন তাহলে বাস্তব স্বাচ্ছন্দ্যকে এত বড় করে দেখ্‌তেন না। আমিও এক সময়ে মনে কর্ত্তাম যে মানুষের মনে বিলাসের যে স্পৃহাটা নানাদিক দিয়ে চরিতার্থ হবার চেষ্টায় ব্যস্ত সেটা মানুষের সভ্যতারই ফল এবং মনের উত্তরোত্তর রঙীন হয়ে ওঠারই পরিণাম। কিন্তু নিরতিশয় স্বাচ্ছন্দ্য ও অভাবের সম্পূর্ণ অভাবটাও যে stagnancy আনে এটা আমার আজকাল খুবই মনে হয়। তাই আমার মনে হয় যে আপনি যদি স্বচক্ষে য়ুরোপটা দেখে যেতেন তাহলে এ সিদ্ধান্তটা আপনার সত্যান্বেষী মনটা কোনও মতেই এড়াতে পার্ত্ত না। আমি কাউকেই যোগী হতে বলি না, কিন্তু য়ুরোপ যে ত্যাগ জিনিষটাকে Sentimentalism বলে উড়িয়ে দিতে চায় সেটাও আমি মস্ত ভুল মনে করি। এজন্য Bertrand Russel মহাশয়ও তাঁর Principles of Social Reconstruction এ Property বলে প্রবন্ধটিতে দুঃখ করেছেন দেখ্‌তে পাবেন। তিনি তাতে দেখিয়েছেন যে মানুষের মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হচ্ছে সৃষ্টিতে, অর্জ্জনে নয়, এবং ধন বা ক্ষমতার্জ্জন স্পৃহাটা বড় জিনিষ নয়। আপনি "শূদ্র-আত্মায়" যে বৃহতের পিছনে ছোটাকে বড় বলেছেন তার সঙ্গে আমি খুবই একমত কিন্তু য়ুরোপে আজকাল বৃহত বল্‌তে অনেকটা ধন ও ক্ষমতার সুরা মনে করে ভুল করে বসে। আপনি যখন বলেছেন যে "একটা নেশা চাইই" তখন যেন মনে হয় যে বৃহত যে কোনও নেশাতেই আপনি সম্মতি দেবেন।

আমাদের বর্ত্তমান নির্জ্জীব অবস্থাতে কোনও বৃহতের পিছনে ছোটার জন্য একটা নাড়া পাবার বিশেষ দরকার একথা আমি খুব মানি কিন্তু তাই বলে যে কোনও বৃহতের পিছনে ছুটলেই আমরা মোক্ষলাভ কর্ব্ব না। য়ুরোপকে আমি আমার সাধ্যমত দেখ্‌লাম। এরা যূথবদ্ধ হয়ে কাজ করাটাকে এতই বড় মনে করে যে তার চাপে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও জীবনের রস সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নিষ্পিষ্ট ও বিবর্ণ হয়ে যেতে থাকে। এটা কেবল আমার ব্যক্তিগত মত নয় Bertrand Russel মহোদয় এ সত্যটি তাঁর Principle of Growth বলে চমৎকার প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছেন। এটা একটা বৃহত কিছু তা অস্বীকার করার উপায় নেই কিন্তু এর অপকার যে উপকারের চেয়ে বেশী তা আজকাল—বিশেষতঃ বিগত হিংস্র যুদ্ধের পরে—প্রায় সকলেই স্বীকার কচ্ছেন। আমার মনে হয় আমাদের বর্ত্তমান জীবনের স্রোতোহীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে আপনি এমন একটা নীতির সমর্থন কচ্ছেন হয়ত তা আপনার উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু আপনার প্রবণতাটা একটু সেই দিকে গড়িয়ে চলেছে যেটা মানুষের জীবনে না বাড়ায় সৌন্দর্য্য, না আনে পরিতৃপ্তি। এইখানে আপনার সঙ্গে আমার একটু মতভেদ হয়, তবে হয়ত আমি আপনাকে একটু ভুল বুঝে থাক্‌তে পারি। সেটা কোথায় তা যদি জানান তবে সুখী হব। আপনার লেখায় আমি যে চিন্তাপ্রবণতা ও openness of mind দেখেছি সেটা ভাল লাগে বলেই আপনার এ ভুল ধারণা (আমি dogmatic ভাবে আপনার এ ধারণাকে ভুল বল্‌ছি না, কারণ আমি open to conviction) দেখিয়ে দিতে অগ্রসর হ'লাম।

ভারতবর্ষ থেকে য়ুরোপকে বোঝা ও এখানে এসে য়ুরোপকে বুঝতে চেষ্টা করা এ দুটি যে কত তফাৎ তা হয়ত আপনি দেশ থেকে ঠিক্ উপলব্ধি কর্ব্বেন না, কিন্তু এখানে যদি নিজে আস্‌তেন তবে দেখ্‌তেন যে একটা ভুলকে সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করে এরা যে অবস্থায়—অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের—এসে পড়েছে সেটার দরুণ এদের চিন্তাশীলসম্প্রদায় রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছে। এটা আমাদের কাছে একটা object lesson হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। Dean Inge এর Outspoken Essays এ Our Present Discontents বলে প্রবন্ধে একস্থলে তিনি লিখ্‌ছেন "It is of course impossible that the worker should not resent having to devote his life to making what is useless and mischievous and to ministering to the irrational wastefulness of luxury." আমি একবার Yorkshireএ খনিতে যারা কাজ করে তাদের মধ্যে বল্লেই হয় দিন সাতেক ছিলাম। তাদের যে কি অবস্থায় থাক্‌তে হয় তা চোখে না দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্ব্বেন না। আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার কথা যখন দেশ থেকে শুনি তখন শুধু চাক্‌চিক্যটাই দেখি আমরা দেখি

ভিতরে হাসিছে মুখরা যামিনী দীপমালা সুখে গলায় পরিয়া

আমরা ভুলে যাই যে

বাহিরে শিশির অশ্রু নয়না বিষাদিনী নিশা কাঁদে গুমরিয়া।

আমি য়ুরোপীয় সভ্যতাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চাই না। যে প্রাণস্পন্দনের আবেগে এরা একটা মিথ্যাকেই সবলে এতদিন

আঁকড়ে ধরে এসে আজ বুঝ্‌তে আরম্ভ করেছে যে সেটা সত্য নয় সে প্রাণস্পন্দনটা একটা মস্ত জিনিষ কারণ এ স্পন্দনটা থাক্‌লে মিথ্যা শীঘ্রই ধরা পড়ে যায়; যে সত্যান্বেষণে এদের বৈজ্ঞানিকরা দিনের পর দিন নিজের ক্ষুদ্র কক্ষে কাজ করে চলেছে সেটা একটা মহৎ বস্তু এবং কোনও mystic কিছুর উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলা সত্ত্বেও এদের চিন্তাশীলসম্প্রদায় যে idealism কে কেমন করে বড় মনে কর্ত্তে পারে (যেজন্য Maeterlinck Our anxious morality প্রবন্ধে বলেছেন "The good faith of mankind knows no defect" না এম্‌নই কি একটা কথা) তাতে আমি প্রশংসাবিস্মিত নয়নে চেয়ে না থেকেই পারি না,—কিন্তু আমি শুধু এই কথা বল্‌তে চাই যে আমাদের বর্ত্তমান স্রোতোহীনতার অবস্থায় যা কিছু মূর্ত্ত ও বোধ্য তাকেই সবচেয়ে বড় মনে কর্লে মস্ত ভুল কর্ব্ব। আমার মনে হয় আপনি ত্যাগ জিনিষটাকে সর্ব্বদাই আমাদের other worldlinessএরই একটা অভিব্যক্তি বলে মনে করে তাকে একটু ভুল বুঝ্‌ছেন। আমাদের ত্যাগের আদর্শটা খুবই বড় কেবল ত্যাগের philosophyটা বর্ত্তমান সময়ের সঙ্গে একটু খাপ খাইয়ে দিতে হয়। মহাপ্রাণ Bertrand Russel মহোদয় তাঁর পূর্ব্বোক্ত property নামক প্রবন্ধে উল্টোদিক্ থেকে ভেবে অনেকটা আমাদের ত্যাগের আদর্শেই এসে পৌঁচেছেন। তিনি বর্ত্তমান জগতে একজন towering intellect এবং বর্ত্তমান সমস্যা নিয়ে যে কত ভেবেছেন তা তাঁর পূর্ব্বোক্ত বইখানি ও Theory and Practice of Bolshevism বইখানিতে বড় সুন্দর ভাবে ব্যাখাত দেখ্‌তে পাবেন। আপনি যদি এই বইখানি পড়ে না থাকেন তবে একবার পড়লে খুব

তৃপ্তি পাবেন। এ থেকে বুঝ্‌তে পারা যায় যে এখানেও লোকে বুঝ্‌তে আরম্ভ করেছে যে ত্যাগের আইডিয়াটা বর্ত্তমান সমস্যা সমূহের সমাধানের পরিপন্থী নয়। তবে আমরা ভুল করি তখন—(যেটা আপনিও বেশ লিখেছেন)—যখন জীবনের আনন্দে আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের অনেক choice spirits ঐ ভাবে জীবনটাকে নিয়েছেন বলে বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে অভিনব চিন্তার ধারা বড় বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু একদিন এখানে একটি জার্ম্মাণ চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে বলেছিলেন "We have neglected this world for a long time and so now this world is neglecting us" সে জার্ম্মাণ ভদ্রলোক এই মহা যুদ্ধের পরে তাঁকে বলেছিলেন "I don't think they committed a mistake" এটা অবশ্য অনেক ঘা খেয়েই তিনি বলেছিলেন। আমি একথা বল্‌ছি না যে আমরা সকলেই আধ্যাত্মিকতাকে জীবনে মেনে চলি—বাস্তবতা আমাদের মধ্যে যথেষ্ট আছে, প্রভেদ এই যে সেটা এদের চেয়ে কম refined অবস্থায়—কিন্তু একথা স্বীকার কর্ত্তেই হবে যে আমাদের মধ্যে অনেক প্রতিভাশালী ও হৃদয়বান লোক জীবনটাতে বিশ্বাস না করে বিরাগী হওয়ার দরুণ আমাদের এ জীবনটা হীন হয়ে পড়েছে। Sincere souls জগতে কমই থাকে এবং তারাই জগতকে প্রাণ, উৎসাহ দেয় ও নিয়ন্ত্রিত করে। আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম সব মহৎলোক সংসারকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে তাকে একরকম ত্যাগ করে এসেছেন বলে যারা রয়ে গেছে তাদের মধ্যে বিরাট্ প্রাণের অস্তিত্ব কমই পাওয়া যায়। এক কথায় বলা যায় ফলে হয়েছে এই যে আমাদের বর্ত্তমান ভারতবর্ষ

সম্পূর্ণ না হোক অনেকটা depleted হয়ে পড়েছে। আমাদের ত্যাগের আদর্শের সঙ্গে এ জীবনে বিশ্বাস ফিরিয়ে আন্‌তে হবে। কেবল এইটুকু আমাদের বুঝে রাখা দরকার যে বর্ত্তমানই একমাত্র বোধগম্য এবং যা কিছু mystic তা অলীক এইটে স্থির করে বস্‌লে চল্‌বে না। কারণ তাহলে শুধু যে আমরা জগতকে কিছু দিতে পার্ব্ব না তাই নয় তাতে আমাদের নিজেদেরও যে লোকসান হবে সেটা মস্ত বড়। এখানে আমি দেখ্‌লাম যে যা কিছু ধরা-ছোঁওয়া যায় না তাই অলীক এরকম একটা ধারণা জনসাধারণের মধ্যে গেঁথে গেছে। অথচ জীবন নিয়ে একটু গম্ভীরভাবে ভাব্‌তে গেলেই mysticism কে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আমাদের ভারতীয় চিন্তার ধারা এই mysticism এর দিকে তার অনেকটা শক্তি ব্যয় করেছে, তাই একে নিতান্ত ছেঁটে দেওয়াও চলে না, কারণ আমার মনে হয় এটা আমাদের একটা সম্পদ্। আপনি খুব সম্ভবতঃ এসব কথা বোঝেন, তবে আশাকরি আমার এ সব কথা আমি কি উদ্দেশ্যে বল্‌ছি সেটা বুঝেই গ্রহণ কর্ব্বেন। যদি কোথাও আমি আপনাকে ভুল বুঝে থাকি তবে জানালে সুখী হব।

আপনার খবর যদি পাই তবে সেটা "স্বাগত" হবে। আমি এখানে (জার্ম্মাণিতে) আরও বছর খানেক সঙ্গীতরূপ ললিতকলার চর্চ্চা করব অভিপ্রায়ে আছি। কাজ কর্ম্মও হচ্ছে বেশ ভালই তবে প্রথম আলাপে আপনাকে সে সব ধারে আমার মতামত জানিয়ে অতিষ্ঠ করে না তোলাই ভাল। আপনাকে সানন্দ অভিনন্দন জানিয়ে আমি আজ বিদায় গ্রহণ কর্লাম। ইতি—

শ্রীদিলীপ কুমার রায়।

55/1, Old Ballygung First Lane,
Ballygung, Calcutta.

প্রীতি নমস্কার—

আপনার চিঠি খানা কয়েকদিন হ'ল পেয়েছি তার উত্তর দিতে কিছু দিন দেরী হ'য়ে গেল। তার কারণ আমার চিঠি পাওয়ার অভ্যাসটাই কম এবং তার চাইতেও কম অভ্যাস চিঠি লিখ্‌বার। তবুও আপনার চিঠিখানির উত্তর যে এত তাড়াতাড়ি (আমার পক্ষে) দিচ্ছি তার কারণ আপনার নাম প্রমথ বাবুর কাছে শুনেছি এবং দ্বিতীয়ত এখানি বিলিতি চিঠি। বিলিতি কথাটা এখানে আমি বিদেশী অর্থে ব্যবহার কর্‌ছি। দেশের প্রতি ভক্তি সমাজহিতৈষী সবারই আছে কিন্তু আবার বিদেশের সম্বন্ধে কৌতূহল সজাগ মানুষ মাত্রেই অনুভব করে। দেশের প্রতি ভক্তির মূলে আছে মানুষের স্বার্থ আর বিদেশের সম্বন্ধে কৌতূহলের মূলে আছে মানুষের রঙিন্ কল্পনা। সুতরাং এর প্রথম বস্তুটী হচ্ছে "তেল নুন লকড়ি"র আর দ্বিতীয়টী হচ্ছে সৌখিন। সুতরাং ওর একটার সঙ্গে আছে কর্ম্মের ভার আর একটীর স্পর্শে আছে অবকাশের আরাম। কাজেই আমাদের মন স্বতঃই স্বদেশের মাটী ছেড়ে বিদেশের আকাশে উড়্‌তে চায়—তা সে জার্ম্মাণীরই হোক্ বা জাপানেরই হোক্—চীনেই হোক্ বা চিলিতেই হোক্। যা নিয়ে নিত্য ঘর কন্না কর্‌তে হয় সে সব জিনিসে মনে রঙ্ ধরে না—অথচ এই রঙের অভাব জীবনকে নেহাৎই নীরস করে' তোলে। সুতরাং আমরা সুযোগ পেলেই দূরের আকাশে আমাদের দৃষ্টি ফেল্‌বার চেষ্টা করি তা সে ইয়োরোপীয়ই হোক্ বা তুরীয়ই হোক্। সুতরাং আমি যে আপনার

বিলিতি চিঠির উত্তর দিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হ'য়ে আলস্যের আরাম জাল ছিন্ন কর্‌ব সেটা নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যের কথা নয়।

আপনি লিখেছেন যে আমাকে চিঠি লিখ্‌বার উদ্দেশ্য যে আপনার সাধু সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য যদি অসাধুও হয় তা হলেও আপনার ভয় পাবার কোন দরকার নেই। কারণ আমার সব লেখার সঙ্গে আপনার পরিচয় থাক্‌লে আপনি দেখ্‌তে পেতেন যে সাধারণতঃ আমাদের দেশের "সাধুর" চাইতে অসাধুদের আমি কম অবিশ্বাসের চোখে দেখি। কেননা অসাধুদের একটা সত্য স্বয়ম্প্রকাশ হ'য়ে থাকে আর "সাধুদের" মধ্যে থাকে একটা অসত্যের সাবয়ব প্রকাশ। ঐ কারণে সাধুর চাইতে অসাধুকে আমার ভয় কম।

সে যা হোক্ এই ভূমিকা করে' এখন কাজের কথায় আসা যাক্। অবশ্য এ জ্ঞান আমার আছে যে চিঠিপত্রে কাজের কথার চাইতে বাজে কথা বেশী কাজের। কিন্তু কেবল মাত্র নাম-শোনা মানুষের সঙ্গে বাজে কথা চলে না। তা কর্‌তে হলে চাই মুখ-চেনা। কেবল মুখ-চেনাতেও হয় না—রীতিমত জানা-শোনা চাই। সুতরাং কাজের কথারই অবতারণা করা যাক্।

এই চিঠির দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত পাত ভরাতে আমার কোনই কষ্ট হত না যদি আপনার মতামত আমার মতামতের একেবারে উল্টো হত। কেননা তবে সহজেই একটা বাক্‌যুদ্ধের অবতারণা করা যেত। হয়ত সে বাক্-যুদ্ধে লজিকের চাইতে ম্যাজিক আলোচনার চাইতে আস্ফালন থাক্‌ত বেশী—হয়ত দিব্যদৃষ্টির চাইতে নব্য আশার শিষ্ট চিন্তার চাইতে অশিষ্ট প্রাণের রঙ্ থাক্‌ত বেশী

কিন্তু তাতে চিঠির পৃষ্ঠা পুরত। আমার মতামতের সঙ্গে আপনার মতামতের ভেদ ও মিল এম্‌নি জড়াজড়ি করে আছে যে ওর ভেদটাকে টান্‌তে গেলেই মিলটাও সেই সঙ্গে সঙ্গে চ'লে আসে। একটা স্পষ্ট attacking point কোনখানেই পাচ্ছি নে। কাজেই পড়েছি মুস্কিলে।

একটা উদাহরণ দি। আমি ত্যাগের কথা নিয়ে অনেক ঘাঁটা ঘাঁটি করেছি। সুতরাং ঐ ত্যাগের কথাটাই নেওয়া যাক্। আপনি লিখ্‌ছেন—"আপনি ত্যাগ জিনিষটাকে সর্ব্বদাই আমাদের other worldliness এরই একটা অভিব্যক্তি বলে' মনে করে' তাকে একটু ভুল বুঝ্‌ছেন।" এইটুকু বলেই যদি আপনি থাম্‌তেন তবে এইখান থেকেই আমি একটা প্রকাণ্ড বক্তৃতা সুরু করে' দিতে পারতুম। এবং সে-বক্তৃতার মূল্য মণ-দরে নেহাৎ বেশী না হলেও গজ-দরে নিতান্ত কম হত না। কিন্তু এ বক্তৃতার আর অবসর থাকে না যখন আপনার চিঠির পরের পৃষ্ঠায় আবার পড়ি—"কিন্তু এ কথা স্বীকার কর্‌তেই হবে যে আমাদের মধ্যে অনেক প্রতিভাশালী ও হৃদয়বান লোক জীবনটাতে বিশ্বাস না করে' বিবাগী হওয়ার দরুণ আমাদের এ জীবনটা হীন হ'য়ে পড়েছে। Sincere souls জগতে কমই থাকে এবং তারাই জগতকে প্রাণ উৎসাহ দেয় ও নিয়ন্ত্রিত করে'। আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এ রকম সব মহৎ লোক সংসারকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে তাকে এক রকম ত্যাগ করে' এসেছেন বলে' যারা রয়ে গেছে তাদের মধ্যে বিরাট প্রাণের অস্তিত্ব কমই পাওয়া যায়।" এর পরে ত্যাগের বিরুদ্ধে আপনার কাছে তর্কের সুরে বক্তৃতা জুড়ে দেওয়া মায়ের কাছে মামার বাড়ীর খবর দেবার সামিলই হবে।

কিন্তু আসলে ত্যাগ জিনিষটাকে আমি আমাদের other worldliness এরই অভিব্যক্তি বলে' মনে করি নি। তা যদি করতুম তবে বোধ হয় ওর বিরুদ্ধে কথা বল্‌তে কম জোর পেতুম। কেননা তখন এই কথাটা না মনে করে' উপায় থাক্‌ত না যে ঐ ত্যাগে সমাজের যে অপকারই হোক্ না কেন ওতে ব্যক্তিগত মানুষের একটা সার্থকতা রয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপার ত তা নয়। আমাদের ষড় রিপু কিছু কম নয় আমাদের অহংজ্ঞানের কিছু কম্‌তি নেই—যে জিনিসটা কম সেটা হচ্ছে আমাদের সামর্থ্য। এই সামর্থ্যের অভাবকেই আমরা একটা ফিলজফির ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে নিজেদের বড় ভেবে আত্মপ্রসাদ পাবার প্রয়াস পেয়েছি। এই আত্মপ্রতারণার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতেই হবে। কলমেও বটে কর্ম্মেও বটে।

আসলে other worldliness এমন একটা সত্য নয় যা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানা চল্‌বে। একটা সুস্থ সবল প্রাণবান মানুষের পক্ষে যার ধমনীতে ধমনীতে জোর রক্ত চলে প্রাণে প্রাণে দুর্ব্বার কর্ম্ম-প্রেরণার তাগিদ রয়েছে তার পক্ষে ইহ জগত অসত্যও নও অসুখেরও নয়। মানুষের ধর্ম্ম ত কেবল মাত্র পারলৌকিক নয় ইহলৌকিকও বটে। এই ইহলৌকিক ও পারলৌকিকের মিলন হলেই মানুষ অলৌকিক হয়ে ওঠে তা নইলে তার যে অবস্থা হয় তা নিয়ে যে গৌরব করে করুক আমি আপনি নিশ্চয়ই করব না। পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ আমি বুঝতে পারি। কিন্তু পঁচিশের নীচেই কারো চোখে এ জগতের রঙ ফ্যাকাশা হ'য়ে গেছে দেখলে আমার সন্দেহ হয় লোকটা এগ্‌জামিনের নোট মুখস্ত কর্‌তে করতে

ডিসপেপ্‌টিক হয়েছে। ত্রিশ পেরুবার আগেই পৃথিবীর দিকে চেয়ে যাদের মন আর খুসী হ'য়ে ওঠে না তাদের আমি অসুস্থ বলে মনে করি। ষাট বছরের গলিত-নখ-দন্ত বৃদ্ধের বরবেশ যেমন বিশদৃশ কুড়ি বছরের কিশোরের মুণ্ডিত মস্তক ও কৌপীন ধারণও আমার চোখে তার চাইতে কম নয়। যে বয়েসে সুন্দরী তরুণীর কালো চোখের আলোর ধ্যান করতে কর্‌তে স্বতসিদ্ধ আনন্দ লব্ধ হবে সে-বয়েসে তুরীয় আলোকের সন্ধান কেবল মানুষের বিধিদত্ত দান ও অধিকারকে অস্বীকার করা তাই-ই নয় ও একটা মানুষের জীবনের বেহিসাবী বোকামী। আপনি এখানে বল্‌তে পারেন যে সুন্দরী তরুণীর চোখের আলো ম্লান হয়ে যায় কিন্তু তুরীয় আলো একবার লব্ধ হ'লে আর তার মার নেই। কিন্তু জীবনের ধর্ম্ম জীবনের রহস্যই ত ঐখানে যে তা নানা রসের নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আনন্দ কুড়্‌তে কুড়্‌তে চলে। শুকদেব হ'য়ে জন্ম-গ্রহণ করার অর্থ আমি খুঁজে পাই নে। অমন অবস্থায় এ-জগতে আসবার দরকারটা কি? জীবনের সুর একটা melody নয় একটা harmony নানা সুরের ঝঙ্কারে তা ঝঙ্কৃত নানা রসের ধারায় তা স্নাত নানা রূপের সমবায়ে তা মূর্ত্ত। এই বৈচিত্রকে যে অনাধ্যাত্মিক বলে তার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। জীবনটাই আধ্যাত্মিক তার সমস্ত রূপ সমস্ত ধর্ম্ম নিয়ে—positive প্রকাশ যেখানেই কিছু দেখব সেখানেই বুঝব, তার পিছনে spirit এর force একটা আছেই আছে। নইলে জড়বাদকেই স্বীকার করে' নিতে হয়।

আপনি লিখেছেন "আমাদের ত্যাগের আদর্শটা খুবই বড়।" আমায় মাপ্ করবেন কিন্তু আপনার ঐ কথাটায় আমাদের

conventional patriotic effusion এর একটা গন্ধ পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের কোন্ ত্যাগের কোন্ আদর্শটা বল্‌তে পারেন? যা খুবই বড়? সেই সব ত্যাগী পুরুষের ত্যাগ কি যাঁরা বিবাহ ক'রে পুত্র কন্যার জন্ম দিয়ে তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব ত্যাগ করে' মঠে গিয়ে আনন্দ-যুক্ত হ'য়ে বসেন? এ-কথাটা আমি আপনাকে বানিয়ে বলছি নে—আমি অমন দু'চারজনকে জানি বলেই আপনাকে তা লিখছি।

আপনি assume করে' নিয়েছেন যে মানুষের জীবনে ত্যাগ বলে' একটা বস্তু আছে। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? আমাদের ত্যাগ কথাটার একটা technical মানে দাঁড়িয়েছে বটে কিন্তু Life এর Philosophy র দিক থেকে তার deeper truth এর দিক থেকে ভিতরের সত্যের দিক থেকে দেখলে দেখতে পাবেন যে ত্যাগ বলে' কোন জিনিসই মানুষের নেই। যা আছে সেটা হচ্ছে একটা কিছুকে বর্জ্জন করে' আর একটা কিছুকে অর্জ্জন করবার জন্যে সাধনা করা প্রস্তুত হওয়া। এই কথাটা যদি মানি ও মনে রাখি তবে দেখতে পাব যে ইয়োরোপের জীবনেও ত্যাগ আছে এবং তা আছে বলেই ইয়োরোপ বড় হয়েছে। একটা মানুষ বা জাতি কিছুই দেয় নি কেবল গ্রহণই করেছে এমন অবিচার সৃষ্টিতে নিশ্চয়ই নেই সুতরাং আমার মনে হয় যে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন স্বরূপ ঐ stock phrase গুলো কিছু দিন শিকেয় তুলে রাখলে ভাল বই মন্দ হবে না। আর কিছু না হোক্ তবে আমরা সত্যিকার করে' ভাবতে চেষ্টা করব।

আপনার চিঠি পড়ে মনে হল যে এই মহাকুরুক্ষেত্রের পর ইয়োরোপে গিয়ে ইয়োরোপের বাহিরের চেহারা দেখে আপনি একটা

shook পেয়েছেন। সেই shook পেয়ে আপনার অন্তরে যে ভাবের উদয় হয়েছে সেই ভাব আপনার চিন্তার গায়ে রঙ লাগিয়েছে। কিন্তু বাইরের ক্ষত চিহ্নকেই কি বড় করে দেখতে হবে? এ-কথা কি আপনার মনে পড়ে' নি যে এই মহাকুরুক্ষেত্রের পর এম্‌নি দুঃখ বেদনা অশ্রুকে বহন করে' ওই ইয়োরোপের মানুষই Mount Everest Expedition এ ছুটেছে মেরু অভিযানে বেরিয়েছে? এম্‌নি একটা বিভীষণ calamity র পর ইয়োরোপ ত দু'হাতে মাথা ধরে' বসে' পড়ে' হা হুতাশ সুরু করে' নি বা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে দু'হাতে মাথার চুল ছিঁড়ছে না। অথচ আমাদের পাড়া প্রতিবেসীর অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত শিউরে গেল। তবুও বল্‌ব ইয়োরোপ মিথ্যা ইয়োরোপের মানুষ মিথ্যা ইয়োরোপীয় সভ্যতার ধ্বংশ হয়ে চুকে গেল? আসলে বাইরের দুঃখের চিহ্নকেই আমরা দেখছি সে-দুঃখকে বহন করছে যে একটা বিরাট প্রাণ শাক্ত সেটাকে আমরা দেখছি নে, সেদুঃখকে কাটিয়ে উঠবার জন্যে সে-প্রাণে যে একটা সাড়া পড়েছে সেটা আমরা দেখছি নে। এ-দেখা ত সত্যিকার দেখা নয়। হাজার হাজার বছর আমরা এ-দেশে আছি Mount Everest এ পদার্পণ করা দূরের কথা সে-কথাও কারো মনে ওঠে নি। অথচ এই মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপের লোকের মাথায় ঐ খেয়াল ঢুক্‌ল। এতে বিস্ময়ের কি কিছুই নেই? অনাধ্যাত্মিক ইয়োরোপ এ শক্তি কোথা থেকে লাভ করছে? কোথা থেকে সংগ্রহ করছে? জড় বস্তু সমষ্টির কাছ থেকে? তা যদি বলেন তবে আপনি নিশ্চয়ই একজন ঘোরতর জড়বাদী অর্থাৎ Materialist.

বাস্তব সুখ বল্‌তে বোধ হয় আপনি material comfort বুঝোতে চেয়েছেন। Material comfort যে বড় এ অপবাদ আমি স্বীকার কর্‌তে পারব না। কিন্তু বাস্তব সুখ যে একেবারে অবাস্তব নয় এ কথা আজ আমাদের বুঝতেই হবে। আপনি Bertrand Russel এর কথা তুলেছেন। তিনি একজন towering intellect কিন্তু সে towering intellect যদি আমাদের পক্ষে lowering intellect এর কাজ করে তবে সেটা বড় দুঃখের বিষয় হবে। মানুষের অন্তরের ভাব তার চিন্তাকে অবিরাম অনুরঞ্জিত কর্‌ছে। আর মানুষের ভাব উদ্বুদ্ধ হচ্ছে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ধাক্কায়। সুতরাং Bertrand Russel আজ যে অবস্থার মধ্যে থেকে যে চিন্তায় উব্বুদ্ধ হয়েছেন সে চিন্তার ফলাফল দিয়ে আমাদের অবস্থা নিয়ন্ত্রিত কর্‌তে চাইলে অত্যন্ত অন্যায় ও ভুল করা হবে। কেননা ইয়োরোপ ও আমাদের অবস্থা সম নয়। সুতরাং Bertrand Russel এর কথা আমাদের সম্বন্ধে কিছু প্রযোজ্য হতে পারে, সব হবে না। ইয়োরোপের অতিরিক্ত আহারের চিকিৎসা আমাদের সংবাৎসরিক অনসনব্যাধি দূর করতে পারবে না। সুতরাং towering intellect মাথায় থাক। আমাদের খাওয়া পরা অর্থাৎ বাস্তব সুখের জোগাড় করতেই হবে। আর ও দুটো জিনিসই material comfort এর ক্যাটিগরিতে পড়ে।

আমি যা কিছু লিখেছি সব ইয়োরোপের দিকে মুখ ফিরিয়ে এ কথা যদি মনে করেন তবে দুঃখিত হব—কেননা তার চাইতে সত্যি কথা যে তা লিখেছি আমাদের দেশের লোকের প্রতি দৃষ্টি রেখে। আপনি ঠিক অনুমান করেছেন যে আপনি ও আমি সম্পূর্ণ অসম

পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকে মানুষ হয়েছি এবং সেই কারণেই আমাদের দেশকে আমি যেমন জানি আপনি তেমন জানবার সুযোগ পান নি। এই যে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ নর নারী—জীবনের ভার-ক্লান্ত—পৃথিবীর স্পর্শ যাদের ত্যাগ করেনি—শুধু লাভের মধ্যে সে স্পর্শের আনন্দটুকু থেকে তারা বঞ্চিত—এদের কাছে বাস্তব সুখের নশ্বরতা প্রচার করলে সেটা শুন্‌তে কি রকম হবে জানেন? সেটা হবে যেন To preach the sin of flesh to a skeleton এটা কি একটা হৃদয়হীন বিদ্রূপ হবে না?

"মানুষের মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হচ্ছে সৃষ্টিতে" খুব সত্যি কথা কিন্তু দুঃখের বিষয় সৃষ্টি করবার ক্ষমতা সকলের থাকে না সুতরাং বাধ্য হয়েই তাদের অর্জ্জনে মনোনিবেশ কর্‌তে হয়। কেননা The most difficult thing is to remain idle. "ধন ও ক্ষমতার্জ্জন স্পৃহাটা বড় জিনিষ নয়" ঐ স্পৃহাটা বড় জিনিষ নয় বটে কিন্তু ঐ বিষয়টী বাজে জিনিষও নয়। ধনকে কেবল মাত্র ধন বলে দেখেই আমরা ভুল করি। কিন্তু ধন মানে ত কেবলমাত্র স্বর্ণ ও রৌপ্য চাক্‌তি নয়—ধন মানে অন্ন, ধন মানে বস্ত্র, ধন মানে স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, অভাবহীনতা—এক কথায় tyranny of flesh থেকে মুক্তি। এবং ঐ অবস্থাতেই ত মানুষ সৃষ্টিতে মন দিতে পারে—ঐ অবস্থাই মানুষের সৃষ্টি করবার পক্ষে সবার চাইতে অনুকূল। গরীব দেশ কোথায় কবে কি সৃষ্টি করেছে? তবে নিরতিশয় স্বাচ্ছন্দ্য Stagnancy আনে—আন্‌তে পারে। কিন্তু অভাবের অতিরিক্ত সম্ভাবটাও আবার demoralisation আনে। Unmixed

good কোথায়ও নেই উপায় কি? এক উপায় মধ্য পন্থা। কিন্তু সে মধ্য পন্থা চিরকাল রক্ষা করে' চলা দুরূহ বলে মনে হয়। কেননা জগতের ইতিহাসে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে ত্যাগ কর্‌তে কর্‌তে ধাক্কা সাম্‌লাতে না পেরে মানুষ মনে প্রাণে হীন দীন অক্ষম হয়ে যায় আবার ভোগ কর্‌তে কর্‌তে তার তাল সাম্‌লাতে না পেরে মানুষ দানব ও arrogant হ'য়ে ওঠে—তারপর crash—তারপর again to begin from the beginning. এই লীলাই ত চল্‌ছে জগতে আবহমানকাল। কুরু পাণ্ডবের কুরুক্ষেত্র আর ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে প্রভেদটা কি খুবই বেশী? চোখ কান বুঁজে কি এই কথাটা বল্‌তে হবে যে মহাভারতের যুদ্ধটা ছিল আধ্যাত্মিক আর ইয়োরোপের যুদ্ধটা হচ্ছে আধিভৌতিক? বরং এই ইয়োরোপীয় মহাসমরে জার্ম্মাণজাতির Right of Superior Culture এর একটা ধূয়ো ছিল সেটা নিতান্ত material plane এর কথা নয়। আর মহাভারতের যুদ্ধের ছিল "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী" মনোভাব। স্ত্রীকে বাজি রেখে যারা পাশা খেলে তারা যে খুব আধ্যাত্মিক সে সম্বন্ধে কোন ভুল নেই—কেননা আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু তাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু যাক্ সে কথা আমার শুধু এইটুকু বল্‌বার উদ্দেশ্য যে বৃথা গৌরবে অহঙ্কৃত না হ'য়ে বিশ্ববিধাতার নিয়মের কাছে একটু বিনীত হ'লে লাভ ছাড়া ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। বিধাতা যে আমাদের দিকে কিছুমাত্র পক্ষপাতিত্ব করেন নি এ জ্ঞান মনে মনে থাক্‌লে আমরা এ রকম superior air নিতে পারতুম না। তখন চাই কি আসল কাজের দিকে মন যেত। আমাদের এক একটী রাজার শত শত মহিষী তবুও তাঁরা আধ্যাত্মিক

আর ইয়োরোপের রাজাদের এক একটী করে' রাণী তবুও বেটারা ভোগে জ্বলে' পুড়ে' মোলো। প্ল্যাট্‌ফর্‌মে দাঁড়িয়ে এ কথা বল্‌লে হাততালি পাওয়া যাবে যথেষ্ট সন্দেহ নেই কিন্তু ঐ হাততালিটাই জাতীয় জীবনের উন্নতির মঙ্গল শঙ্খ কি না সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

লিখ্‌তে লিখ্‌তে চিঠিটা প্রকাণ্ড হ'য়ে গেল। এইবার ইতি দেব একটা শেষ কথা বলে'। আপনি লিখেছেন—"য়ুরোপকে আমি আমার সাধ্যমত দেখ্‌লাম। এরা যূথবদ্ধ হ'য়ে কাজ করাটাকে এতই বড় মনে করে' যে তার চাপে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও জীবনের রস সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নিষ্পিষ্ট ও বিবর্ণ হ'য়ে যেতে থাকে।" এ কথা শুনে আশ্চর্য্য হওয়া ছাড়া উপায় নেই in spite of Bertrand Russel. আপনি এখন জার্ম্মাণীতে। জার্ম্মাণীতে state idea ও Military discipline সে দেশের লোকদের ব্যক্তিত্ব অনেকটা নিষ্পিষ্ট করে' এনেছিল সন্দেহ নেই—কিন্তু ইংলণ্ড বা ফ্রান্স সম্বন্ধেও কি ঐ কথাটা খাটে? অবশ্য এই কথাটা মনে রাখ্‌তে হবে যে লক্ষ করা নিরানব্বুই হাজার ন'শ নিরানব্বুই কি তার চাইতেও বেশী জনের কোন বিশেষ ব্যক্তিত্বই নেই। তারা সামাজিক স্রোতে ভেসে চলে। ঐ বাদ দিয়ে ইউরোপীয় নেশানের শীর্ষস্থানীয় লোকেরাও যে সব ভেড়ার পাল বনে' গেছে এ কথা গলাধঃকরণ করা কঠিন। যুদ্ধের আগে পর্য্যন্তও ইয়োরোপে আর্ট সায়েন্স সাহিত্য এ তিনই আপন আপন জয়ধ্বজা তুলে রেখেছিল। আর ঐ তিনটিই হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত সাধনালব্ধ জিনিস। মানুষের ব্যক্তিত্ব মুছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ থেকে ও তিন বস্তু অন্তর্ধ্যান করবে।

আজও ইয়োরোপে যে ব্যক্তিত্ব নিষ্পিষ্ট হয়ে মুছে যায় নি Bertrand Russelই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর ইয়োরোপের জীবনের রস যদি বিবর্ণ হয়ে গিয়েই থাকে তবে আমার মতে সে ভালই হয়েছে। কেননা সে রস এতটা অতিরিক্ত লাল হ'য়ে উঠেছিল যে তা একটু বিবর্ণ হ'য়ে গোলাপী আভা ধারণ কর্‌লে নেহাৎ মন্দ হবে বলে' আমার মনে হয় না। ইতি—

৬ই জানুয়ারী, ১৯২২।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পুঃ—এ চিঠি লেখা সুরু করেছিলুম অনেক আগে। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের তোড়ে বরাবর হাতে কলম রাখ্‌তে পারি নি। সুতরাং চিঠি শেষ করতে করতে পুরাতন বছর গিয়ে নতুন বর্ষ এসে পড়্‌ল।

জার্ম্মাণী সম্বন্ধে দুই চারিটি সাধারণ কথা।

—:০:—

কোনও জাতির সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কোনও কথা বলা বড় কঠিন, অথচ আমাদের মন এরূপ ভাবে গঠিত যে সে মাত্র কতিপয় fact (দৈনিক সত্য) এর গণ্ডিতে আবদ্ধ থাক্‌তে চায় না। দৈনিক সত্য থেকে সাধারণ নীতি গড়ে তুল্‌তে না পার্লে আমরা অনেক সময়েই এই ভেবে ভুল করে বসি যে জ্ঞানের মূল শিকড় গজায়নি। কারণ দু চারটি বিরাট্ চিরন্তন নীতি ছাড়া সাধারণতঃ আমরা সাধারণ নীতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়ে মোটেই জীবনের বিকাশ সাধন করি না, যেমন ভাবে ঘটনাচক্রের সাম্‌নে পড়ি তেম্‌নি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে সামঞ্জস্য করে চলি। বর্ত্তমান দার্শনিকদের মধ্যে এক সম্প্রদায় বল্‌ছেন যে একটা ইচ্ছাসৃষ্ট উদ্দেশ্য (Conscious purpose) আমাদের জীবনকে চালায় না, চালায় অসম্বন্ধ অভিলাষ (impulse) একথা আমার সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হয় না, কিন্তু আমরা যে সাধারণ নীতির প্রণোদনায় জীবনকে মঞ্জরিত করে তুলি না লিখেছি এটা তারই একটা extreme অভিব্যক্তি। কিন্তু কোনও নীতির extreme অভিব্যক্তি সত্য না হলে তাতে মূল নীতির বিশেষ সম্ভ্রমহানি হয় না বলে বোধ হয় একথা বলা যেতে পারে যে "দৈনিক সত্য" থেকে সাধারণ নীতি গড়ে তুল্‌তে না পারাটা মনের বিকাশের অভাব সূচিত করে না। কিন্তু when all is said and done ব্যক্তি

থেকে সাধারণ নীতিতে পৌঁছবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের এতই বেশী যে তা না কর্লে যেন আমাদের কাছে "জীবনটা ঠেকে কেমন ফাঁকা ফাঁকা।" আমরা যখন নিশ্চিন্ত উৎসাহে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পাদি করি তার মধ্যে আমরা এই সাধারণ মতামত যে কত বেশী প্রচার করে থাকি—অর্থাৎ ইংরাজীভাষায় যাকে বলে sweeping generalisation—সেটা একটু লক্ষ্য করে দেখ্‌লেই উপরোক্ত সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কিন্তু সত্যে নিষ্ঠা যতই বাড়ে এই সাধারণ সত্য প্রচারের উৎসাহে ততই ভাঁটা পড়ে আসে। কারণ সৃষ্টি বিচিত্র ও গতিশীল ও তার সম্বন্ধে সাধারণ মতামত প্রচার করা বিপজ্জনক।

কিন্তু একটা জাতির বাইরের গুণাগুণ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা ততটা বিপজ্জনক নয়। অবশ্য যে কোনও জাতির মনোজগতের গভীরতম সুরের কোনও সন্ধান পেতে হলে তার জন্য যথেষ্ট সত্যানুসন্ধিৎসা, যোগ্যতা ও অপক্ষপাতিত্ব দরকার। কিন্তু বাইরের গুণাগুণ বুঝ্‌তে তত সময় লাগে না এই ভেবে আমি জার্ম্মাণ জাতির বহির্গুণাগুণ সম্বন্ধে দু চারটি কথা সাধারণ ভাবে বল্‌বার ধৃষ্টতা প্রকাশ কর্ব্ব। এ বিষয়ে অবশ্য আমার ঠিক্ যা মনে হয় তা বল্‌বার অধিকার আমার আছে মনে করে লেখনী ধরা গেছে।

জার্ম্মাণ মধ্যবিত্তদের একটু কাছ থেকে জান্‌বার সুযোগ এখানে পাওয়া যায় আমার এমতামত অন্যত্র প্রকাশ করেছি বলে সে সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বল্‌ব না। তবে আমার সে উক্তিটিকে নিছক্ সত্য বলে ধরে নিলে একটু ভুল হতেও পারে। কারণ এবিষয়ে দুএকজনের অভিজ্ঞতার উপর এতবড় সাধারণ সত্য প্রকাশ করা

চলে না। একে একটা বড় সাধারণ সত্য বল্‌ছি এই জন্য যে একে জাতি, তার উপর বর্ণগত ভেদজ্ঞানের, হাত হতে মুক্তি পাওয়া যে কোনও জাতির কাছেই কঠিন। এ ভেদজ্ঞানের হাত হতে সমগ্র মানবের একযোগে নিষ্কৃতি লাভ করা রূপ milleniumএর দিন এখনও আসেনি। তবে আমি শুধু এই কথা বল্‌তে চাই যে এখানে ব্যক্তিগত ভাবে এমন অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের সঙ্গে আসা যায়—যেটা বিলাতে যায় না—যাঁরা এই কুসংস্কারের হাত হতে কমবেশী উদার নীতির বশবর্ত্তী হয়ে মুক্তি লাভ করেছেন। এরকম লোকের সংখ্যা যত বেশী হয় মনুষ্যত্বের খাতায় জমার দিকে তত বেশী লাভ। এই সাধারণ সত্যতে অবশ্য আমি নিজের ও দুই চারজন বন্ধুর অভিজ্ঞতা থেকেই পৌঁছেছি—এবং সেটার অধিকাংশ "দৈনিক সত্য" থেকে তা বলাই বাহুল্য, অর্থাৎ অনেকগুলি পরিবারে নিমন্ত্রণ ও আপ্যায়ন ব্যক্তিগত ভাবে পাওয়া যায় এই দৈনিক সত্য থেকে। কিন্তু এ বিষয়ে অপরের অভিজ্ঞতা যে ঠিক্ আমার বা আমার কতিপয় বন্ধুর অনুরূপ হবেই এমন কথাও জোর করে বলা চলে না। তবে অতটা না ভেবেও এ আদর আপ্যায়নটা হৃদয়ের গভীরতম স্তরের অভিব্যক্তি নয় বলে এ সম্বন্ধে generalise করা তত বিপজ্জনক নয়। যদিও আমি একথা বল্‌তে চাই না যে এর দাম খুব কম। মানুষকে কাছ থেকে দেখ্‌তে পাওয়ার সুযোগ জীবনের পরিণতির পক্ষে যত বড় সহায়, বইপড়া বা উপদেশ তত বড় সহায় নয় বলে আমি বিশ্বাস করি, এবং মানুষকে যতই ঘনিষ্ঠ ভাবে জান্‌তে পারা যায় মনের সম্পদ্ ততই রস সঞ্চয় করে। তাই আমি কবির কথায় সায় দিই। "Friendship is a gift of life which one

bestows standing and which one must receive on bended knees" * অবশ্য এতবড় কথাটা প্রযোজ্য কেবল সবচেয়ে বড় বন্ধুত্বের উপর যেটা জীবনে বড় বেশী পাওয়া যায় না এবং যেটা বিদেশে "পাব" আশা করে না আসাই ভাল। তবে আমি কাছ থেকে জান্‌তে পারা যায় বল্‌তে এ কথা জ্ঞাপন কর্ত্তে চাই না যে এরকম বন্ধুত্বলাভের সুযোগ এখানে "লঙ্কায় সোনার" মত সস্তা, আমি কেবল এই সরল সত্যটুকু জানাতে চাই যে এদের সঙ্গে যে সরল ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ এখানে পাওয়া যায় তা থেকে যথেষ্ট লাভ কর্ব্বার আছে।

আমার মনে হয় জার্ম্মাণ ভদ্রপরিবারকে যে নিকট থেকে জান্‌বার সুযোগ বিদেশী এখানে পায়—সেকথা একদিন একজন এদেশবাসিনী মহিলাও আমাকে বলেছিলেন—সেটা এদের মনে একটা স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা ও নিরপেক্ষা spirit of appreciation এর অন্যতম অভিব্যক্তি মাত্র। আমি যতদূর দেখ্‌লাম—এইখানে একটা মস্ত বিপজ্জনক generalisation কর্ত্তে বাধ্য হচ্ছি—তাতে বোধহয় এক রুশিয়ান জাতি ছাড়া অন্য কোনও জাতির মধ্যেই উপর্য্যুক্ত গুণদুটি এত বেশী পথেঘাটে চোখে পড়ে না (এখানে বিস্তর রাশিয়ান ভদ্রলোক refugee হয়ে আছেন ও তাঁদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বলেই এ কথা লিখ্‌লাম।) এর জন্য দুচারটে ছোট-খাট দৃষ্টান্ত দেওয়া দরকার মনে করি কারণ এইসব ছোটখাট সত্য অনেক সময়ে একটা জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার পক্ষে—পথপ্রদর্শক না হলেও—যথেষ্ট সহায়তা করে।

*D'Annunzio—"Honeysuckle"

প্রথমতঃ ইংলণ্ডে ফরাসীদেশে ও সুইট্‌জরল্যাণ্ডে পুস্তাকাগারে ঢুকলে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ বই এখানকার মত এত বেশী দেখতে পাওয়া যায় না। সেখানে সব চেয়ে বেশী মজুত থাকে সাময়িক সাহিত্যের বই—যাকে trash রূপ সাধারণ আখ্যা দিতে আমি ইতস্ততঃ কচ্ছি—এবং সে সবের অধিকাংশই দেশীয় লোকের লেখা। পক্ষান্তরে এখানে যে কোনো পুস্তকাগারে (এবং এত বেশী পুস্তকাগারও আমি কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না) প্রবেশ কল্লেই দেখতে পাই রাজ্যের serious বই, এবং তার মধ্যে এত বেশী বই বিদেশী ভাষা থেকে অনূদিত যে তার ইয়ত্তা হয় না। এথেকে কেউ যদি মনে করেন যে জার্ম্মান সাহিত্যে সার কম বলেই তারা বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদে এত বেশী আগ্রহশীল তবে তিনি কেবল বিশ্ব-সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতাই ঘোষণা করে বস্‌বেন। কারণ এখানে জাতীয় সাহিত্যিকের গ্রন্থেরও অভাব নেই—কিন্তু তা বলে এরা বিদেশী ভাষা থেকে সার সঙ্কলন কর্ত্তে মোটেই অনিচ্ছুক নয়। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইংরাজী বা ফরাসী ভাষায় যে বিদেশী সাহিত্য অনূদিত হয় না একথা বলা অবশ্য আমার উদ্দেশ্য হতে পারে না। আমি কেবল বল্‌তে চাই এই কথা যে সেক্ষেত্রে বিদেশী পুস্তক ফর্ম্মাশ না দিলে পাওয়া যায় না, আর এখানে যে কোনও সামান্য পুস্তকাগারেও Shakespeare, Wilde, Shaw, Flaubert, Hamsun, Dostoevsky, Dante, Tolstoy, Turgenev Rabindranath, Romain Rolland আর কত নাম কর্ব্ব?—ঢুকলেই চোখে পড়ে। এতে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও খুসি হয়েছি বলেই একথা বেশী করে লিখলাম। কারণ

সামান্য সাধারণ পুস্তকাগারেও যে এ সব নিতান্ত serious বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ সাজান থাকে তাতে এটা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রমাণ হয় যে এসব বই এখানে খুব কাটে। অন্যত্র দেখা যায় যে Paul be Cock, William le Queux, Rider Haggard Elynor Glyn, Charles Garvice প্রমুখ তৃতীয় শ্রেণীর লেখকের পুস্তকেই দোকান ভর্ত্তি। তাতে একথা অবশ্য প্রমাণ হয় না যে অন্যত্র লোকে serious সাহিত্য পড়ে না, তাতে কেবল এই প্রমাণ হয় যে এখানে সাধারণে তা যত পড়ে ও বিদেশী সাহিত্যের মধ্যে যতটা রস পেয়ে থাকে অন্যত্র ততটা নয়। আমার মনে হয় যে যেখানে পুস্তকাগারের এত প্রাদুর্ভাব সেখানে বিদেশী উচ্চ সাহিত্যের পুস্তকের এত ছড়াছড়ি ব্যাপারটি থেকে এরূপ সাধারণ সত্য প্রচার করা নিতান্ত অন্যায় নয়।

এখানে এলেই রবীন্দ্রনাথের পুস্তক প্রত্যেক show-window তে যেরকম ভাবে চোখে পড়ে অন্যত্র কোথাও সেরকম পড়ে না এবং শুধু "ঘরে বাইরে" (Das Heim und die Welt) চোখে পড়ে তাই নয়, তাঁর Nationalism ও Sadhana-র মত দার্শনিক বইও সাজান দেখা যায়। এর মধ্যে অনেকটা উৎসাহ যে অন্য সব বিষয়ের মত সাময়িকতার বা ফ্যাসানের অনুবর্ত্তিতার দরুণ তা স্বীকার করে নিলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর যথার্থ সমজদার দৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গতঃ কবির প্রতি কৃতজ্ঞতা আসে যিনি ভারতকে জগতের গোচরে আন্‌বার পক্ষে এতটা সহায়তা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হয় যে তাঁর যথার্থ গুণগ্রাহী এখানে যত বেশী পাওয়া যায় অন্যত্র বোধ হয় তত

নয়। দুই একটা "দৈনিক সত্য" সূচক উদাহরণ দেওয়া দরকার মনে করি। একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁর কন্যার কাছ থেকে একটি চিঠি পড়ে আমাকে একদিন শোনালেন। তাতে কন্যা লিখছেন যে তিনি Das Heim und die Welt বইখানি দুবার পড়েও তৃপ্তিলাভ করেন নি শীঘ্রই মাতাপুত্রীতে আর একবার একত্রে পড়বেন। যেহেতু একত্রে পাঠে রসোপভোগ বেশী হয়। আর একটি পরিবারে আর একদিন সন্ধ্যানিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। তরুণী নব বিবাহিতা বধূ আমাকে সোৎসাহে রবীন্দ্রনাথের অনেক গুলি বই দেখালেন এবং বল্‌লেন যে তাঁরা বই গুলি আভিজাত্যের মত আল্‌মারীতে সাজিয়ে রাখার জন্য কেনেন নি, সত্য সত্যই পড়ে শেষ করেছেন। গার্হস্থ্য জীবনে সাংসারিক নানাবিধ উদ্বেগ ও এদের বর্ত্তমান দুঃখময় জীবনের মধ্যেও এরা বিদেশী সাহিত্য থেকে যে এরকম ভাবে রস গ্রহণ করে সে জন্য এদের প্রতি শ্রদ্ধা না এসেই পারে না!

জার্ম্মাণ জাতি জগতের খবর এত রাখে যে সেটা আশ্চর্য্যের বিষয়। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সাহিত্যের এক অধ্যাপকের সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ হওয়ার সৌভাগ্য হবার দরুণ আমি এদের মধ্যে প্রাচ্যের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব যে শিক্ষিত-সমাজে কতটা চারিয়ে পড়েছে—তার অনেক ছোটখাট "দৈনিক সত্য" রূপ প্রমাণ পেলাম। তা থেকে এদের বিদেশীর প্রতি—বিশেষতঃ ভারতীয়দের প্রতি—ভাল ভাবের কারণ অনেকটা বোঝা গেল। এখানে অনেক শিক্ষিতা মহিলাই দেখতে পাই আমাদের সম্বন্ধে কিছু না কিছু পড়েছেন এবং এত লোককে আমাদের দেশকে

"পরীরাজ্য" (Märchenland) বল্‌তে শুনেছি যে তাতে আমাদের জাতীয় দৈন্য সত্ত্বেও সে জন্য মনের অনেকটা কষ্টের উপশান্তি হয়। পক্ষান্তরে মনে পড়ে ইংলণ্ড দেশে আমাদের সম্বন্ধে সাধারণতঃ লোকের অজ্ঞতা যদিও সেখানকার লোকের আমাদের সম্বন্ধে বেশী খবর রাখার কথা। আমার এক ভারতীয় ডাক্তার বন্ধু—যিনি ইংলণ্ড দেশে কুড়িবৎসর বাস কচ্ছেন আমাকে এ সম্বন্ধে একটি গল্প বল্লেন। একটি ইংরাজ মহিলার পুত্র কার্য্যব্যপদেশে ভারতবর্ষে যাত্রা করে। স্নেহোদ্বিগ্না মাতা আমার ডাক্তার বন্ধুকে নিরতিশয় উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞাসা করেন "Tell me Doctor, they are not all cannibals up there, are they ?" ইনি অশিক্ষিতা নন্ এবং ভারতের প্রতি যে বিশেষ কোনও অবজ্ঞা বশতঃ এ প্রশ্ন করেছিলেন তা নয়, ইনি, আন্তরিক অজ্ঞতা বশতঃই করেছিলেন। জার্ম্মাণীতে কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখি লোকে জানে যে "We are fallen on evil times" হলেও আমাদের সভ্যতা একদিন মহিমময় ছিল। এটা মনের উদারতার ও সত্যপ্রিয়তার প্রমাণ-সূচক একটি অন্যতম "দৈনিক সত্য" (fact) যার বলে আমি উপরি লিখিত গুণ দুটি সম্বন্ধে সাধারণ মত প্রচার করবার একটু প্রণোদনা পেয়েছি।

বিদেশী গুণের মূল্য যে এরা খুব বেশী দেয় তার আর একটি "দৈনিক সত্য" রূপ প্রমাণ এদের থিয়েটারে বিদেশী নিতান্ত serious নাটকের অভিনয়। আমি এখানে এসে এই আশ্চর্য্য সত্যটি লক্ষ্য কল্লাম যে শেক্ষপীয়র এখানে যত পঠিত ও অভিনীত ইংলণ্ডে তার সিকিও নয়—অন্ততঃ অভিনয় ত নয়ই। উদাহরণতঃ আজকাল ইংলণ্ডে শেক্ষপীয়রের কোনও নাটক একাদিক্রমে তিন মাসও

অভিনীত হয় না যখন হয় বৎসরে একবার কি দুবার কতিপয় দিনের জন্য হয়ে থাকে যেস্থলে chu chin chow এর মত trash ও চারবৎসর ধরে প্রত্যহ অভিনীত হয়। অবশ্য শেক্ষপীয়র—অনুরাগীর সংখ্যা যে তরল নৃত্যগীত যুক্ত নাটিকা অনুরাগীর চেয়ে কম হবে এতে আমি দুঃখ প্রকাশ কচ্ছি না, কারণ মানুষের মনোজগতের সৌন্দর্য্য চিত্রণের অনুরাগীর সংখ্যা সর্ব্বত্রই "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ" রূপ মহানীতির তপস্বীদের তুলনায় কম হবেই হবে, আমি বল্‌তে চাই কেবল এই কথা যে লণ্ডনের ৬০।৭০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে অন্ততঃ এতগুলি দর্শক আশা করা অসঙ্গত নয় যাদের দ্বারা শেক্ষপীয়রের বা ইব্‌সেনের কোনও নাটক তিন মাসের বেশী পরিপুষ্ট হতে পারে। পক্ষান্তরে এখানে দু তিনটি থিয়েটারে শেক্ষপীয়র প্রায়ই অভিনীত হয়। তাহারা Ibsen এর Peer Gynt ও অন্য নাটক, Strindberg এর Todestanz (Dance of death) ও অন্যান্য নাটক, Hamsum এর নাটক প্রভৃতির অভিনয়ে রীতিমত ভীড় হয়ে থাকে। কাজে কাজেই এ সব "দৈনিক সত্য" থেকে এ সাধারণ সত্যে পৌঁছান বোধহয় অসমীচীন নয় যে এখানে জনসাধারণ অপেক্ষাকৃত গম্ভীরচিত্ত, যদিও চার্ব্বাকানুবর্ত্তিদের দল যে এখানে বিরল তা বলা আমার মোটেই উদ্দেশ্য নয়।

সঙ্গীতানুরাগে এদের অভ্রভেদিত্ব অবিসংবাদিত বলে সে সম্বন্ধে আর বেশী করে লেখার দরকার নেই। কেবল একটি ছোট "দৈনিক সত্য" জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত হব। এক একজন উদ্যোক্তা (Kappelmeister=conductor) এখানে পর পর প্রতি সপ্তাহে একটি করে concert দিয়ে থাকেন। অত্যন্ত গম্ভীর সঙ্গীত, যার নাম

classical music. তার জন্য একত্রে সব কন্‌সার্টগুলিরজন্য টিকিট কিন্‌তে হয়। প্রথম কন্‌সার্টের আরম্ভের সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশ হওয়া মাত্র সাত আটদিনের মধ্যে সমস্ত reserved স্থানগুলির season টিকিট নিঃশেষ। তা আবার প্রথম কন্‌সার্ট আরম্ভের দুমাস আগে, আমি এত আগে থেকে গিয়েও unreserved টিকিট ছাড়া অন্য টিকিট পেলাম না। এ থেকে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের জন্য এজাতির উৎসাহ সহজেই অনুমেয়। এ একটি নিতান্ত সাধারণ "দৈনিক সত্য" মাত্র, সকলেই এরকম ব্যাপারটাকে স্বতঃ সিদ্ধবৎ ধরে নেয়।

এই সব দৈনিক সত্য থেকে একথা মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত নয় যে এদের মধ্যে serious-mindedness বস্তুটির প্রাদুর্ভাব অন্যত্রের চেয়ে একটু বেশী। তবে সময়ে সময়ে সেটা একটু বেশীদূর গড়িয়েছে বলে মনে হয়। কারণ এরা খেলায় তত আনন্দ পায় না। আমি যেমন একদিকে স্বীকার করি যে খেলায় আনন্দ নিম্নস্তরের আনন্দ, তেম্‌নি একথাও বল্‌তে বাধ্য যে জাতীয় জীবনে এর প্রয়োজন আছে। মানুষের জীবনকে সবল, ও স্বাস্থ্যকর করার পক্ষে খেলাটা বড় ভাল জিনিষ। তা ছাড়া যারা খেল্‌তে ভালবাসে তাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ঋজুতা ও ঈর্ষার প্রতি অবজ্ঞা জন্মায় এটা আমি ইংলণ্ডে থাক্‌তে লক্ষ্য করেছি। উদাহরণতঃ, যারা খেলায় ভাল তারা সচরাচর একটু সোজা পথে চল্‌তে ভালবাসে দেখা যায়—অবশ্য ব্যতিক্রম আছেই। সেইজন্য আমি খেলাকে আনন্দানুভূতির দিক্ দিয়ে উচ্চস্থান না দিলেও—যেহেতু intellectual ও artistic আনন্দের স্থান তার অনেক উপরে পরসেবার আনন্দের ত কথাই

নাই—পরোক্ষভাবে তার দাম দিতে বাধ্য। তাই ইংরাজের জাতীয় জীবনে এইটি তাদের একটি বড় গুণ বলে মনে করি এবং আমাদের মধ্যে এ গুণের আদর হওয়া দরকার বলে বিশ্বাস করি। কেবল এই কথা বল্‌তে চাই যে এক্ষেত্রেও খেলাকে আকাশে তুলে ধরে perspective হারিয়ে ফেল্‌লে চল্‌বে না, যেমন ইংরাজ জাতির মধ্যে অনেক সময়ে দেখেছি। উদাহরণতঃ বাৎসরিক অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজের নৌকাচালন প্রতিযোগে টেম্‌স নদীতে জনসংখ্যা এত অধিক হয় যে তা নাকি না দেখ্‌লে বিশ্বাস করা কঠিন। এদের মধ্যে যদি সকলে নৌকাচালন ভাল করে দেখ্‌তেও পেত তাহলেও বা বুঝ্‌তাম। কিন্তু যখন এই বিরাট্ জনসঙ্ঘে তা অসম্ভব তখন যে এদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ পঞ্চাশজন হুজুগের জন্যই ঠেলাঠেলি করে তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং এরূপ হুড়াহুড়িকে গুণের আদর নাম না দিয়ে হুজুগের আদর আখ্যায় অভিহিত করাই বোধ হয় শ্রেয়স্কর। তা ছাড়া কেম্ব্রিজে ও অক্‌স্‌ফোর্ডে অনেক সময়ে দেখেছি যে যে ছাত্র খেলায় ভাল সে পাঠাদি মুখ্য কাজে অবহেলা কর্লেও কি অন্য ছাত্রেরা কি কর্তৃপক্ষ কেউই সেটাকে কিছু দূষ্য মনে করে না। তাছাড়া সেখানে অনেকে বলেন যে খেলায় বন্ধুত্ববন্ধন বড় চমৎকার দৃঢ় হয়। কিন্তু আমার মনে হয় যে এরূপ ধারণা আমাদের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে ধারণার অস্পষ্টতারই পরিচায়ক। খেলায় যে প্রীতির ভাব আসে তা কোনও স্থলেই বন্ধুত্ব হতে পারে না যদি না সেই সঙ্গে উচ্চতর ভিত্তির উপর তার প্রতিষ্ঠা করার উপায় থাকে। অর্থাৎ বন্ধুত্ব জিনিষটি এতই সুলভ নয় যে একসঙ্গে একটু হৈ হৈ কর্লেই তার মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হতে পারে। এজন্য প্রথম ও শেষ বন্ধন

সহানুভূতির গ্রন্থি ও জীবনের উচ্চতম সমস্যাতে মনের মিল; ছোট-খাট বিষয়ে যতই মতদ্বৈধ থাকুক না কেন আসে যায় না। মাত্র খেলায় যে প্রীতির প্রতিষ্ঠা তাকে বন্ধুত্ব নাম দেওয়া অনুচিত সেটাকে সাহচর্য্য বলাই ভাল (এর ঠিক সংজ্ঞা হচ্ছে Camaraderie)। এর দাম নেই এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় আমি কেবল তুলনায় এর স্থান যে যথার্থ বন্ধুত্বের ঢের নীচে এই কথাই বল্‌তে চাই।

জার্ম্মাণীতে কিন্তু পথেঘাটে বা হোটেলাদিতে এরা অপরের সঙ্গে ব্যবহারে ফরাসী বা ইংরাজজাতির মত শিষ্ট polite নয়। সব তাতেই এরা একটু যাকে বলে rough without being conscious of it. এমন কি এদের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যবহারেও এরা শিষ্টতাকে মোটেই আমল দেয় না। এ পক্ষে বহুল "দৈনিক সত্যের" অন্যতম হচ্ছে এই যে এরা ট্রাম বা ট্রেনে স্ত্রীলোকের জন্য খুব কম ক্ষেত্রেই আসন ছেড়ে দেয়। এ শিষ্টতা ইংলণ্ডে সব চেয়ে বেশী। ফরাসীরাও এবিষয়ে ইংরাজের পিছনে। এরা কেন স্ত্রীলোকের প্রতি এই সুন্দর ভদ্রতা প্রকাশ করে না জিজ্ঞাসা কর্লে নানা মত প্রকাশ করে কিন্তু সে সব কারণ আমার কাছে সত্য মনে হয় না। আমার মনে হয় আসল কারণ এই যে এদের অন্তর্জগতের নিভৃতপ্রদেশে এই ধারণা জাগে "There's no nonsense about us." আমি স্ত্রীলোকের প্রতি এই নিতান্ত সস্তা শীলতা প্রকাশকে স্ত্রীজাতির-প্রতি-শ্রদ্ধা-আখ্যায় অভিহিত কর্ত্তে কুণ্ঠিত—কারণ সেটা ঢের বড় ও শক্ত জিনিষ—আমি শুধু এই কথা বলি যে এটা মানুষের মনে refinement বাড়ানর একটা অন্যতম শিক্ষা। তাই এ আচারটী প্রচলন সর্ব্বত্রই হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে না করেই

পারি না। তবে সন্ধ্যাপার্টি প্রভৃতিতে লৌকিক ভদ্রতার আড়ম্বরে মিথ্যা complement এর আতিশয্যে এবং দারুভূতের মত হাস্যকর bow করা রূপ গুণে এরা যে জগতের কোনও সভ্যজাতির পিছনে নয় আমার এ গভীর আবিষ্কারের কথাটি না লিখে এ প্রবন্ধের শেষ কর্লে তাদের প্রতি মহান্ অবিচার করা হবে।

জার্ম্মাণজাতির জনসাধারণের ভাবভঙ্গীতে একটা জিনিষ আমার বড় বেশী করে চোখে ঠেকে। সেটা হচ্ছে এদের বাইরের অত্যন্ত বেশী হাত মুখ নাড়া। আমি ইংরাজজাতির কাষ্ঠবৎ আদব-কায়দার অনুরাগী নই, "ঐ কে শুনে ফেল্‌ল" ইত্যাকার লোমহর্ষক আশঙ্কায় সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা অর্দ্ধস্ফুটভাবে কওয়া উচিত এমন কথাও মনে করি না, কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাও বল্‌তে চাই যে ইংরাজ জাতির ভাবে ভঙ্গীতে একটা আড়ষ্টভাব থাক্‌লেও একটা আত্মসম্ভ্রমবোধের অস্তিত্ব বিদ্যমান। জার্ম্মাণজাতির এদিকে ততটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি নেই। ফরাসীজাতিও খুব হাত মুখ নেড়ে কথা কওয়াতে বিশ্বাস করে যদিও ইংরাজেরা তাতে হাসে। একথা একদিন একটি ফরাসী মহিলাকে বলায় তিনি আমাকে বলেছিলেন "আমরা ইংরাজ-জাতির মত কাঠের পুতুল নই, আমরা মানুষ এবং ভাবে ভঙ্গীতে সেটা দেখাই এই মাত্র"। সে যাই হোক্ জার্ম্মাণজাতির হাত মুখ নাড়ার মধ্যে সে মাধুর্য্য নেই যেটা ফরাসীজাতের অনুরূপ ভঙ্গীমার মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়—বিশেষতঃ ফরাসীরমণীর মধ্যে। আমি নিজে ফরাসী ভাষার লালিত্যে হয়ত একটু বেশী মুগ্ধ বলে ফরাসী-রমণীকে অজানিতভাবে এই লালিত্যে ভূষিত করে থাক্‌তে পারি—কারণ সকলেই জানেন ভাষার লালিত্য সব চেয়ে বেশী মূর্ত্ত হয়ে

ওঠে স্ত্রীলোকের ও শিশুর মুখে—কিন্তু যখন আমার মনে হয় যে রুশরমণীর চালচলনেও মাধুর্য্য জার্ম্মানদের চেয়ে বেশী তখন বোধ হয় যে জার্ম্মাণ ভাষার লালিত্যের অভাবই জার্ম্মাণ মহিলার "chic" (পারিপাট্য) এর অভাবের কারণ নয়, মনে করাতে তাদের প্রতি অবিচার করে বসার দোষ আমাকে স্পর্শ কর্ব্বে না, যেহেতু রুশ ভাষাও তেমন কিছু সুললিত নয়।

অবশ্য এ সম্পর্কে আমি খুব জোর করে এমন কথা বল্‌তে চাই না যে জার্ম্মাণজাতির চাল চলনের অপেক্ষাকৃত মাধুর্য্যের অভাব বিশ্বজনীন, কারণ আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি এমন দুই একটি জার্ম্মাণ পরিবারের সঙ্গে একটু নিকট সংস্পর্শ লাভ করেছি যেখানে জার্ম্মাণতরুণী বাইরের চরিত্রের কমনীয়তায় ফরাসী বা ভারতীয় রমণীর চেয়ে কোনও অংশে হীন নন। তবে একটা কথা আমি বোধ হয় নির্ভয়ে বল্‌তে পারি যে জার্ম্মাণরমণী পোষাক কেমন করে পরিধান কর্ত্তে হয় সে বিষয়ে ফরাসীরমণীর কাছে এখনও অনেককাল শিখ্‌তে পারেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি ইংরাজ, রুষ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, বুল্‌গেরিয়ান ও সুইসজাতির সঙ্গে সংস্পর্শে এসেছি কিন্তু বোধহয় নানাবিধ "দৈনিক সত্য"থেকে পোষাক পরা বিষয়ে এই সাধারণ সত্য প্রচার করা যেতে পারে যে চমৎকার সরল অথচ সুন্দর ভাবে বেশ ভূষা করার কলায় ফরাসীজাতির সমকক্ষ জাতি জগতে নেই।

জার্ম্মাণজাতির সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে বিশেষ করে কিছু বল্‌বার নেই। পুরুষ ও নারীর মধ্যে অন্যান্য দেশের মত সৌন্দর্য্য ও সৌন্দর্য্যের অভাব এখানেও দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং অন্যান্য দেশের মত

এখানকার রমণীর মধ্যেও দুই রকম সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে পাওয়া যায় এক, যা নয়নের প্রীতিপ্রদ ও piquant অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ের গঠন বশে দেখ্‌লেই পেতে ইচ্ছে হয় এবং অন্যটি স্থির, স্নিগ্ধ ও পবিত্র যাকে দেখ্‌লেই হৃদয় আনন্দে লুটিয়ে পড়ে কিন্তু স্পর্শ কর্ত্তে সাহস করে না।

শ্রীদিলীপ কুমার রায়।

দিল-মহলের গল্প।

—:*:—

অতি মোলায়েম অতি মিষ্টি যেন সোহাগ-মাখান' একটা সারেঙ্গীর সুর জুলেখার কানে এসে বাজ্‌ল। জুলেখা দূরাগত বেণুরব-শোনা হরিণীর মতো চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল—ডালিমের রসে রাঙান ছোট্ট পাদুখানি হিঙ্গুলের মতো লাল মখমলের চটিতে ত্রস্তে ঢুকিয়ে দ্বারের কাছে এসে নৈরাশ্য-ব্যাকুলতা মিশ্রিত কণ্ঠে ডাক্‌ল—"বাঁদী বাঁদী!"

বাঁদী তার আঠার বছরের দেহভঙ্গী নিয়ে চোখের কোনের হাসির নেশা নিয়ে ঠোঁট দুখানিতে রঙিন্ অবসরের তৃপ্তির অবলেপ নিয়ে এসে জুলেখাকে কুর্নিশ করে' দাঁড়াল। জুলেখা বল্‌লে—"বাঁদী সারেঙ্গীর সুর শুনেছিস্? কোথা থেকে আস্‌ছে জানিস্?"

"বিবি সাহেবা নীচে যমুনায় কার নৌকো যায়, সেই নৌকোয় কে সারেঙ্গী বাজাচ্ছে—এ তারি সুর।"

জুলেখা বল্‌লে—"বাঁদী যমুনার দিকের জানালা খুলে দে—আমি দেখ্‌ব।"

"ওদিকের জানালা যে খুলবার হুকুম নেই বাদশার, বিবি-সাহেবা!"

"বাদশার হুকুম যাতে পাস্ তাই করিস্"—জুলেখা তার আঙুল থেকে কলিজার রক্তের মতো লাল চুনি বসান' একটা আংটী খুলে বাঁদীর হাতে দিল—বল্‌লে—"এতেও কি বাদশার হুকুম পাবিনে?"

বাঁদী পাতলা ঠোঁটে রঙিন্ হাসি এনে চোখের কোণে একটা নিরর্থক কটাক্ষ টেনে বল্‌লে—"বাদশার হুকুমের জন্য ভাবনা কি

বিবি-সাহেবা—আপনার রূপের গুণে যে জানালা বন্ধ হয়েছে আপনার রুপেয়ার টানে আবার তা খুল্‌বে—বাতায়ন আমি খুলে দিচ্ছি।"

বাদশার হাজার-দুয়ারী বিলাস-ভবনের হাজার চাবীর গোছা থেকে একটা চাবী বেছে বাঁদী বাতায়নের কপাট খুলে দিল।

নীচে নৃত্যরতা কিশোরী যমুনা। গোধূলির সোনালি সোহাগে বুক তার রাঙা হ'য়ে উঠেছে। দেহে তার রূপের জোয়ার, প্রাণে তার নেশার জোয়ার—দু'কূল ছুঁয়ে তার যৌবনের টান মুক্তির বান।

সেই রূপের জোয়ারে প্রাণের জোয়ারে নেশার জোয়ারে যৌবনের জোয়ারে মুক্তির জোয়ারে একখানি ছোট্ট নৌকো ভেসে চলেছে যেন আপন মনে। সেই নৌকোর ছইয়ে বসে এক কিশোর যুবক, হাতে সারেঙ্গী কণ্ঠে গজল।

গজল বল্‌ছিল—ওরে দরদী তোরে ধরে' রাখ্‌লে আমি ব্যথা পাই—তোরে ধরে' রাখ্‌তে গেলে তোর মুখের হাসি মিলিয়ে যায় তোর চোখের কোণে অশ্রু জাগে—তোর অভিমানের সুর এমনি করুণ হ'য়ে বাজে—ওরে দরদী—ওরে যাদুকর.....

ওরে দরদী তোরে ছেড়ে দিয়ে আমি স্বস্তি পাইনে—তোরে ধরে' রাখ্‌লে তুই শুকিয়ে উঠিস্ তোকে ছেড়ে দিলে তুই মৃত্যু পানেই ছুটিস—তবুও তোর চলার নেশা থামে না—ওই চলাই যে তোর মৃত্যু আবার জীবন—ওরে দরদী—ওরে যাদুকর.....

পতঙ্গকে যে আগুণে পুড়তেই হবে—তবু ও-রঙিন্ নেশার সুখ সে কেমন করে' ছাড়্‌বে? থামার মাঝে অমৃত নেই, চলার মাঝে মৃত্যু আছে—এ তোর কি কৌতুক,—ওরে দরদী—ওরে যাদুকর.....

সারেঙ্গীর সুর গজলের কথা আর যুবকের যৌবন-শ্রী এই তিনে মিলে জুলেখার অন্তরে কতদিনের-সুপ্ত বনের হরিণটীর মাথা তুল্‌ল—ওরে

"সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে
কে তারে বাঁধ্‌ল অকারণে"

ওই যে যমুনার ওপারে সবুজ-বনানীর গাঢ় ছায়া সে আজ কি নিবিড় মায়া জুলেখার মনে মনে বিছিয়ে দিল—বাদশার এই ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিত প্রমোদ-ভবন এ যেন রাশি রাশি কঙ্কালের একটা বোঝা এর ঐশ্বর্য্য এর সুখ এর স্বাচ্ছন্দ্য কি অর্থহীন—এর চাইতে ঐ সবুজ বনের কালো ছায়া, স্তব্ধ দুপহরের মৌমাছিগুঞ্জন বাতাসে ভাসা বনফুলের গন্ধ সে কি সুখের কি তৃপ্তির কি সার্থকতার—এ সুখ এ তৃপ্তি এ সার্থকতার পাশে ধীরে ধীরে জুলেখার অন্তরে ভেসে ওঠে যুবকের যৌবন-শ্রী-মণ্ডিত মুখ.....

সারেঙ্গীর সুর গজলের কথা আর যুবকের যৌবন-শ্রী এই তিনে মিলে জুলেখার অন্তরের কতদিনের সুপ্ত বিহঙ্গমকে জাগ্রত কর্‌ল—

"আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী"

ওই যে আকাশ ছাওয়া রক্ত সন্ধ্যা ঐ যে নিবিড় নীল, সে কি সুন্দর কি মহান্—বাদশার এই যে মুক্তি-কুণ্ঠিত বিলাস-ভবন এ যেন রোগক্লিষ্ট একটা বিভীষিকা এর পুষ্পবীথি এর হাস্য-মুখর ঝরণার ধারা এর ফুলের গন্ধ, কি একটা বিরাট দৈন্য-ঘেরা প্রাণ-হীনতা—ঐ যে আকাশের নিবিড় নীলিমা, ঐ যে দিগন্তের নিমন্ত্রণ, ঐ যে অশেষ পথের আভাস মুক্তির সঙ্গীতে সে কি সম্পদশালী, হৃদয়ের

সঙ্গীতে সে কি ভরপুর নৃত্যে নৃত্যে সে কি উল্লাসময়—এ সুখ এ সঙ্গীত এ উল্লাসের পাশে ধীরে ধীরে জুলেখার অন্তরে ভেসে ওঠে যুবকের যৌবন-শ্রী-মণ্ডিত মুখ.....

সারেঙ্গীর সুর আর গজলের কথা আর যুবকের যৌবন-শ্রী এই তিনে মিলে আজ জুলেখার অন্তরে সুখের কার্পণ্যের চাইতে ব্যথার আনন্দকে গরীয়ান্ করে' তুল্‌ল—এই বিরাট বিলাস-ভবন, হৃদয়-ছেঁচা মানিক ত এর কোনখানেই নেই—কক্ষে কক্ষে এর পুরু গালিচা দেয়ালে দেয়ালে বহুমূল্য দেয়ালগিরি দিকে দিকে আরশি এ যে কেবল আশরফিরই ভারে ভারাক্রান্ত—এর চাইতে বনের ছায়া কাননের মায়া আকাশের নীলিমা দিগন্তের ডাক্ কি মর্ম্মস্পর্শী কি ব্যথা-ভরা সুখের—এ সুখের পাশে জুলেখার মনে জেগে ওঠে যুবকের যৌবন-শ্রী-মণ্ডিত মুখ-মণ্ডল তার প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত কেশ-কলাপ সুবঙ্কিম ভ্রূ গভীর-দৃষ্টি আঁখি।

নৌকা যমুনার বাঁকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল—বাঁকের মুখে একটা অপেক্ষার আভাস রেখে—একটা আমন্ত্রণের ইঙ্গিত রেখে।

জুলেখা বল্‌লে—"বাঁদী এই যুবক কে জানিস্?"

হাসির রঙে রঙিন্ করে' জুলেখা উত্তর দিলে—"তা আর জানিনে বিবি-সাহেবা—তা না জান্‌লে কি আমাদের চলে!"

"তোর বক্তৃতা শোনবার আমার অবসর নেই বাঁদি—জানিস্ ত বল।"

ঠোঁট দুখানিতে সিরাজির নেশা ঢেলে বাঁদী বল্‌লে—"বাদশার দরবারে যে তাতারকান্দের নূতন রাজদূত এসেছে এ তারি ভাগ্‌নে নাম সৈয়দ মহম্মদ আফজল ওসমান্ আলি।"

"এঁকে একবার এখানে আন্‌তে পারিস্?"

"সে কি বিবি-সাহেবা! এখানে ত বাইরের কোন পুরুষকে নিমন্ত্রণ করবার হুকুম নেই বাদশার!"

"এই হুকুমটা কি আর বাদশার কাছ থেকে আদায় কর্‌তে পার্‌বি নে"—জুলেখা তার হৃদয়ের উপরকার মণিহার খুলে বাঁদীর হাতে দিল—রং তার জুলেখার চোখের তারার মতোই গভীর নীল—তা জুলেখার চোখের তারার মতোই বিদ্যুৎ ক্ষরণ করে—বল্‌লে—"এতেও কি তোর হুকুম মিল্‌বে না?"

"খুব মিল্‌বে বিবি-সাহেবা—আপনার রূপের জ্বালায় যে-হুকুম রদ হয়ছে আপনার এই কণ্ঠমালায় আবার সে-হুকুম মিল্‌বে। ওস্‌মান আলিকে কবে আন্‌তে হবে?"

"বাদশা পরশু আস্‌বেন না। ওঁকে পরশু আনিস্।"

"বহুৎ খুব বিবি-সাহেবা।" বাঁদীর পাতলা ঠোঁটের কোণে বিদ্যুতের মতো একটু হাসি খেলে গেল। সে হাসিতে প্রচ্ছন্ন ছিল সমরকন্দে তৈরী তরতরে ধারওয়ালা গুপ্ত ছুরির সূক্ষ্মাগ্রভাগের শিহরণ-হানা একটুকু চিকিমিকি।

(২)

দুই হাঁটুর মধ্যে কোষবদ্ধ তরবারী রেখে হাব্‌শী ঢুল্‌ছিল—ঘাঘরার খস্ খস্ শব্দ পেয়ে হাব্‌শী চোখ মেল্‌ল—বাঁদীকে দেখে তার জোঁকের মতো ঠোঁটদুটোর মাঝে মুক্তোর মতো দু'সার দাঁত জেগে উঠ্‌ল। জিজ্ঞেস কর্‌ল—"কে তুই? বাদশার খাস কামরায় তোর কি দরকার?"

রেশমী আঙ্গরাখায় ঢাকা বুক দুটোকে আরও ফুটিয়ে তুলে মুষ্টিবদ্ধ

দু'হাত কটির দু'দিকে ন্যস্ত করে' পাতলা ঠোঁটে গাম্ভীর্য্য এনে বাঁদী বল্‌ল—"নাম আমার পিয়ারী বেগম, পেশা বাদশার বিলাস-ভবনের খাস্ বাঁদী, জন্মস্থান ইরাক্, বিক্রীতস্থান সিরাজের বাজার, হাল সাকিন দিলমহল, ভারত সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাজ্ঞী—দরকার বাদশার সঙ্গে রাজকার্য্য আলোচনা।"

হাব্‌শী তার বিকট মুখ হাসিতে আরো বিকট করে' তুলে বল্‌ল—"ভারত সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাজ্ঞী! আমাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াবি না ত?"

"খাওয়াব না! তোকে আর জহর বেগমকে এক সঙ্গে সবার আগে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।"

"কেন আমার আর জহর বেগমের উপর তোর কি রাগ?"

"তুই আবলুশের মতো একটা হাব্‌শী আমার সঙ্গে ইয়ারকি দিস্ তাই তোর উপরে রাগ—আর জহর বেগম ধুত্‌রোফুলের মতো সাদা একটা ইহুদি আমার সঙ্গে ইয়ারকি দেয় না তাই তার উপর রাগ। সর্ পথ ছাড় বাদশা আমায় ডেকেছেন।"

হাব্‌শী উঠে দরজার পরদা সরিয়ে ধর্‌ল—পিয়ারী বাদশার খাস্ কামরায় প্রবেশ কর্‌ল।

বাদশা একটা প্রকাণ্ড সাদা ইরাণী বিড়ালকে কোলে নিয়ে তার গলায় একটা মুক্তোর মালা পরিয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌ছিলেন—আর বিড়ালটা সে মালার কোন অর্থ না পেয়ে ঘোরতর আপত্তি কর্‌ছিল।

তাঁর বিলাস-ভবন দিলমহলের খাস্ বাঁদীকে দেখে বাদশা বিড়ালের সঙ্গে খেলা থেকে বিরত হলেন—জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"কিরে বাঁদী খবর কি?"

বাঁদী বিদ্রূপের ভঙ্গিতে আভূমি-প্রণত একটা কুর্নিশ করে' বল্‌ল—"জনাব—জাঁহাপনা—খোদাবন্দ—খবর খারাপ।"

"তোদের দেশে খারাপ খবর জন্মে নাকিরে বাঁদী?"

"তা আর জন্মে না জাঁহাপনা! যেখানে শিরীন্ প্রাণ জরীন্ রূপ যেখানে যৌবনের ছন্দ সিরাজীর গন্ধ যেখানে দিবসের অবসর নিশীথের স্বপ্ন খারাপ খবর জন্ম নেবার স্থানই ত সেখানে।"

"বাঁদী তুই যে কেন গজল লেখা সুর করিস্‌নি বুঝিনে—কর্‌লে চাই কি তুই একটা দিলমহলের বাঁদী না হ'য়ে দুনিয়ার দিলের যাদুকর হ'য়ে উঠ্‌তি—হাফেজ ফারদৌসির মতোই অমর হ'য়ে যেতি।"

"অমরত্বের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র টান নেই জাঁহাপনা! আমার সমস্ত আকর্ষণ মর্ত্ত্যের প্রতি। যা থাক্‌বে না যা লয় হবে যা দু'দিনের তার যে বেদনা সে বেদনার যে-সুখ আমার জীবনের সমস্ত লোভ সেই বেদনা সেই সুখের জন্য। যে ফুলের পাঁপড়ি ঝরে' যায়, যে সিরাজীর নেশা উবে যায়, যে যৌবনে ভাঁটা পড়ে, যে বসন্ত নিদাঘ-ক্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে তাই-ই আমার চোখে রঙিন্। অমর হবার ইচ্ছা দুনিয়াতে স্থায়ী ডেরা বাঁধার ইচ্ছা—জনাব আপনার দিল-মহলের বাঁদীর সে ইচ্ছা নেই। যে ঠোঁটে হাসি অবিরাম লেগে আছে চিরদিন লেগে থাক্‌বে সে ঠোঁট ত অমূল্য নয় সে ঠোঁট আমার কাছে মূল্যহীন।"

"বাঁদী তোকে দরবার করে' আমি কবির খেতাব ও খেলাৎ দেব। এ সব কথা তোকে কে শিখিয়েছে?"

বাঁদীর ধনুকের মতো ভ্রূর নীচে টানা দু চোখের কাল-বোশেখের মেঘের মতো নিবিড় কালো তারা রোদ-পড়া ইস্পাতের ছুরীর

মতো ঝক্ ঝক্ করে' উঠ্‌ল—বল্‌লে—"শিখিয়েছে আমার জীবনের নেশা—আমার ভোগের নেশা—জাঁহাপনা আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে শোণিত রিরি কর্‌তে থাকে যখন দেখি আপনার খাসমহলে আপনার দিলমহলে————— " বাঁদী হঠাৎ আপনাকে সম্বরণ করে' হাল্‌কা হাসির সুর মিশিয়ে বল্‌লে—"জাঁহাপনা আপনার দিলমহলের চিঁড়িয়া উড়ু উড়ু।"

"বলিস্ কি বাঁদী! এই ঘন বাদলে?"

"পিঁজরার চিঁড়িয়ার কি আর বসন্ত বাদল দেখবার অবসর থাকে জাঁহাপনা?"

"তবু বাদলেই চিঁড়িয়া উড়্‌বে?"

"পিঁজরার সুখ কবে বাদলের দুঃখের চাইতে সুখের বাদশা?"

"চিঁড়িয়ার নাম?"

"নাম জুলেখাবানু, বাদশার দিলবাহার বেগম।"

জুলেখাবানুর নাম শুনে বাদশা কোলের বিড়ালটাকে গালিচার উপর ছুঁড়ে ফেললেন—বিড়ালটা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মাথা উল্‌টিয়ে মনোযোগের সঙ্গে পিঠ চাট্‌তে লাগ্‌ল। বাদশা সোজা হ'য়ে বসে ক্রোধের স্বরে বল্‌লেন—"বাঁদী তুই ঝুঁটবাত শিখেছিস্।"

"তাস্‌কান্দের নতুন রাজদূত মিরজা আলির ভাগ্‌নে খাপ্‌সুরত নবীন যুবক ওসমান আলি দিলমহলে আমন্ত্রিত জাঁহাপনা।"

"তোর গর্দ্দান যাবে বাঁদী জানিস্?"

"দিলমহলের দিলবাহার বেগমের দিল ওস্‌মান আলির রূপ-সাগরে ভেসেছে জাঁহাপনা—ওসমান আলি সে নৌকোয় পাল তুল্‌বে পরশু সন্ধ্যেকালের মিঠে বাতাসে।"

"তুই নেশা করেছিস্ বাঁদী?"

হঠাৎ বাঁদী হাসির একটা মিঠে গিট্‌কিরিতে সমস্ত কক্ষ প্রতিধ্বনিত করে' মেঝে পর্য্যন্ত নত হ'য়ে একটা কুর্নিশ করে' বল্‌লে—"জাঁহাপনা বাঁদীর গোস্তাফি মাপ করুন—আমি ঠাট্টা করছিলেম।"

বাদশা যেন ক্ষণকালের জন্য প্রকৃতিস্থ হলেন কিন্তু পরক্ষণেই একটা দারুণ সন্দেহ তাঁর চোখের পাতে ঘনিয়ে এলো—ছোট্ট চোখের তীব্র দৃষ্টি পিয়ারীর মুখের উপর নিবদ্ধ করে' বললেন—"বাঁদী আবার মিথ্যে কথা সুরু করেছিস্—এ ঠাট্টা নয়—এ সত্যি।"

"জাঁহাপনা এ ঠাট্টাও নয় এ সাচ্চাও নয়—এ ঝুঁটা—ওস্‌মান আলির সঙ্গে জুলেখাবানুর সাক্ষাৎ কেমন করে' হবে?"

"তোর গর্দ্দান যাবে জানিস্ বাঁদী—এ মিথ্যা নয়—এ সত্যি।"

"এ যদি সত্যি হয় জাঁহাপনা তবে আপনার দিলমহলের বাঁদী হাস্‌তে হাস্‌তে গর্দ্দান দেবে—না জাঁহাপনা এ সত্যি নয় এ মিথ্যা।"

"ঠিক বল্‌চিস্?"

"আল্লার কসম জাঁহাপনা।"

বাদশা স্মিত হাস্যে মার্জ্জার-পরিত্যক্ত মুক্তোর মালাটা বাঁদীর হাতে দিয়ে বল্‌লেন—"বাঁদী তোর বখ্‌শিশ—কিন্তু খবরদার এমন ঠাট্টা আর করিসনে—কর্‌লে হাবশীর সঙ্গে তোর সাদী দেব।"

"জাঁহাপনার দিলকে রঙিন্ রাখবার জন্যেই এমন ঠাট্টা মাঝে মাঝে করি জনাব।"

বাদশা ব্যথাভরা কণ্ঠে ধীরে ধীরে বল্‌লেন—"বাঁদী তুই জানিস্ নে বয়স যত বাড়ে দিল তত পাকে—বাঁদী এখন তোর কাজে যা।"

বাঁদী নিষ্ক্রান্ত হল। যাবার সময় হাব্‌শীকে একটা মিঠে নজর বখ্‌শিশ দিতে ভুলল না।

বাঁদীর ঠোঁটের কোনে গোপন মৃদু হাসি আর চোখের কোনে রুদ্র প্রলয়ের বহ্নি-লেখা।

বাদশা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কৌচে হেলে পড়লেন। কিন্তু সে স্বস্তির ভাব তাঁর বেশীক্ষণ রইল না, ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরে একটা অসোয়াস্তি জেগে উঠল—ধীরে ধীরে তাঁর ললাটে চিন্তা রেখা অঙ্কিত হয়ে গেল—ঠোঁটদুটো কঠিন হ'য়ে উঠল—চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল—বাদশা সোজা হ'য়ে উঠে বস্‌লেন—তাঁর চোখ দুটো স্পষ্ট যেন ঘোষণা করতে লাগল—খুন—খুন—খুন। বাদশা কঠোর কণ্ঠে ডাকলেন—"বান্দা!"

পরদা সরিয়ে তৎক্ষণাৎ হাবশী এসে কুর্ণিশ করে' দাঁড়াল। বাদশা বললেন—"উজির!"

উজির এসে দাঁড়াতেই বাদশা বললেন—"উজির পরশু সন্ধ্যে-বেলা বাদশার কি মর্জ্জি?"

উজির বললেন—"জাঁহাপনা পরশু সন্ধ্যেবেলা তাস্‌কান্দের রাজদূতকে দাবাখেলার আমন্ত্রণ করেছেন বাদশা।"

বাদশা বললেন—"সে আমন্ত্রণ নাকচ উজির। আমার আর কোন হুকুম নেই।"

"জাঁহাপনার মর্জ্জিই আইন।"

উজির নিষ্ক্রান্ত হলেন। বাদসা শূন্য কক্ষে পায়চারী করে' বেড়াতে লাগলেন—উদ্বিগ্ন, উন্মনা, উত্তেজিত।

(৩)

দুইজনে নির্ব্বাক নিস্পন্দ—কৌচে উপবিষ্ট জুলেখা আর কক্ষে প্রবেশ-দ্বারের কাছে দণ্ডায়মান ওসমান। বিরাট বিস্ময় ওস্‌মানের চোখে—একটা পরম আনন্দ কম্পন দুজনার বক্ষে—দুজনার মুখে একটী কথা নেই—কেবল পরস্পরের দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ যেন পরস্পর পরস্পরকে দৃষ্টি দিয়ে গ্রাস করতে চাচ্ছে।

দিল-মহলের ঝাউবীথি থেকে ময়ুর ডেকে উঠল—দুজনার চমক ভাঙল। জুলেখা যেন একটা পরম আকাঙ্ক্ষা কণ্ঠে নিয়ে বললে—"ওসমান!"

ওসমান ছুটে গিয়ে জুলেখার পায়ের কাছে গালিচার ওপরে বসে' পড়ল—যেন তার সমস্ত হৃদয়টা—সমস্ত আত্মাটা সেইখানে লুটিয়ে দিল। যেন তার সমস্ত অহঙ্কারকে জুলেখার পায়ের কাছে নত করে গদগদ কণ্ঠে বললে—"রুবেয়া—তুমি—তুমি—আমি যে তোমায় কত খুঁজেছি। সেই বাগদাদে দেখা—তারপর আর এক-বার ইস্পাহানে তোমায় দেখি—তারপর তুমি কোথায় অদৃশ্য হ'লে। তারপর শুন্‌লেম তুমি কাইরোতে। কাইরোতে গিয়ে আমি তোমাকে তন্ন তন্ন করে' তিন বছর খুঁজেছি—তারপর হঠাৎ শুনি যে তুমি হিন্দুস্থানে, তাই আমিও হিন্দুস্থানে এসেছি। কিন্তু বাঁদী যখন জুলেখা-বানুর নাম করলে তখন ত আমি স্বপ্নেও ভাবি নি এই আমার রুবেয়া।"

একটা পরম বেদনা কণ্ঠে নিয়ে রুবেয়া বল্‌লে—"হাঁ ওসমান আমি—আমি—রুবেয়া—আজ জুলেখাবানুর নামে। কিন্তু জুলেখা-বানুর ছদ্মনাম ছদ্মবেশ যে আজ আমার কাছে বিষ হ'য়ে উঠেছে—এ

ছদ্মবেশ ছদ্মনাম থেকে যে আমি মুক্তি চাই—ওসমান আমাকে উদ্ধার কর।”

ওসমান চকিত দৃষ্টিতে একবার কক্ষের চারিদিকে দেখে নিল, তারপর পরম আগ্রহ পরম ব্যাকুলতার স্বরে বল্‌লে—“এই ঐশ্বর্য্য,—এই সম্পদ—এই সুখ—”

“সুখ!” তীব্রকণ্ঠে রুবেয়া বলে’ উঠল—“সুখ কোথায় ওসমান? এই বন্দীশালে? আরবের মরুভূমিতে যার জন্ম—দিগন্তপ্রসারি আকাশ থেকে যে জন্ম হ’তে প্রাণবায়ু সংগ্রহ করেছে—যাবজ্জীবন যে মুক্ত মরুর বক্ষের উপরে ঘোড়া ছুটিয়ে খেলা করেছে তার সুখ এইখানে? তার উপর একটা হৃদয়হীন লম্পট বাদশার মুখের প্রণয়-সম্ভাষণ—না, না ওসমান আমার দেহ মন প্রাণ বিষে বিষে জর্জ্জরিত হয়েছে। এখানে হয় আমার মৃত্যু নয় এখান থেকে আমার মুক্তি চাই-ই চাই।”

আনন্দের আলোকে ওসমানের চোখদুটো উদ্ভাসিত হ’য়ে উঠল—ওসমান অতি সন্তর্পণে অতি যত্নে যেন তাতে হৃদয়ের সমস্তখানি সোহাগ ঢেলে দিয়ে রুবেয়ার একখানি হাত আপন হাতে তুলে নিল—বল্‌লে—“রুবেয়া——

কাল-সর্পের প্রলয়-নিশ্বাসের মতো একটা নিশ্বাস সমস্ত কক্ষটাকে যেন একটা তড়িতের ধাক্কা দিয়ে সন্ত্রস্ত করে’ তুল্‌ল। চকিতে দু’জনে তাকিয়ে দেখলে—দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে বাদশা স্বয়ং।

বাদশার বদ্ধমুষ্ঠি কোষবদ্ধ ছুরিকার বাঁটে—চোখ দুটীতে তাঁর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের হিংস্র দৃষ্টি—বাদশার সর্ব্বশরীর থর্ থর্ থর্ থর্ করে’ কাঁপছে—ক্রোধে সর্ব্ব মুখমণ্ডল তাঁর লাল হ’য়ে গেছে।

চকিতে ওসমান উঠে দাঁড়াল—কোষবদ্ধ ছুরিকা কোষমুক্ত করে’ বাদশার দিকে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল—ঠোঁটের কোনে তার দারুণ ঘৃণার অবলেপ—চক্ষে তার স্থিত প্রতিজ্ঞের ঐকান্তিক দৃঢ়তা।

প্রাণপণ কষ্টে আপনাকে সংযত করে’ কণ্ঠস্বরে যেন প্রলয় বিষ উদ্গারিত করে’ বাদশা বললেন—“ওসমান-আলি জাহান্নামে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।”

ওসমান স্থির কণ্ঠে বললে—“হুশেন তোগলক আমি প্রস্তুত—তবে জাহান্নমে যাবার জন্যে নয়, সেখানে অন্যকে পাঠাবার পথ করে’ দেবার জন্যে।”

“তবে আত্মরক্ষা কর্ বেইমান।”

বাদশা ছুরিকা নিষ্কাষিত করে’ ওসমানকে আক্রমণ কর্‌লেন। চক্ষের পলকে ছুরিকা-যুদ্ধ-কুশল হুশেন শা তাঁর ছুরিকা আমূল ওসমানের বক্ষে বসিয়ে দিলেন—ওসমান কক্ষতলে লুটিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু—কণ্ঠ দিয়ে তার একটী শব্দ উচ্চারিত হবার অবসর পেলে না!

ওসমানের বক্ষ হতে ছুরিকা খসিয়ে নিয়ে বাদশা কক্ষের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন—কক্ষ শূন্য। ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মতো শোণিত-সিক্ত ছুরিকা হাতে বাদশা কক্ষ থেকে বেরুলেন। পিয়ারী যেন সেইখানে অপেক্ষা করছিল—বাদশা বললেন—“বাঁদী শয়তানী বেইমানী জুলেখা কোথায়?”

নিঃশব্দে পিয়ারী একটা কক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলে বাদশা বেগে সেই কক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন—এক পদাঘাতে

দ্বার উন্মুক্ত করে' কক্ষে প্রবেশ করলেন—প্রবেশ করেই তাঁর চমক্ লাগল।

কে বললে আজ দিল-মহলে জীবন-মৃত্যুর খেলা চলছে—কে বললে আজ সেখানে হিংসা প্রতিহিংসার অভিনয় হচ্ছে—তবে এ রোসনাই কেন! এ উৎসব-সজ্জা কেন! এখানে কি প্রবেশ করবে ছুরিকা-হস্তে প্রতারিত প্রণয়-বঞ্চিত—না পারিজাত মালা হাতে আনন্দ-বিহ্বল প্রেমিক?

সহস্র আলোকে কক্ষ আলোকিত। বেলোয়ারী ঝাড়ের আতসী কাঁচে লক্ষ লক্ষ রশ্মি প্রতিফলিত হ'য়ে বহুলক্ষ হ'য়ে তা চারিদিকে ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ছে। রক্তের রঙের চুনি আশমানী রঙের নীলা কত রঙ বেরঙের হীরে জহরত পান্না মোতি কক্ষময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—তাতে আলো পড়ে হাজার রঙের হাজার রশ্মির তীর ছুটছে। যেন আলোর দেয়ালী লেগেছে—আলোর হাসি আলোর গান আলোর নাচ—আলোর সুর আলোর স্বপ্ন, আলোর কল্পনা—আলোকে আলোকে চতুর্দ্দিক আলোময়।

সেই আলোর মাঝে যেন চতুর্দ্দিক আরোও উজ্জ্বল করে' দণ্ডায়মানা জুলেখা-বানু—সর্ব্বাঙ্গ একটা কাশ্মিরী শালে আবৃত—গর্ব্বোন্নত তার শির তড়িৎ-শিখা তার দৃষ্টি।

মুহূর্ত্তে যেন বাদশা আত্মবিস্মৃত হলেন। সম্মুখে পরম রমনীয় পরম কমনীয় পরম কাম্য রমণী—চতুর্দ্দিকে হাজার আলোকের রোসনাই—এ যে স্বর্গ সৃষ্টি করে বসে আছে। কিন্তু পরক্ষণে আপনাকে সংযত করে' বজ্র-কঠোর কণ্ঠে বললেন—"বেইমানী মরবার জন্যে প্রস্তুত হ'।"

কণ্ঠস্বরে সমস্ত সোহাগ ঢেলে দিয়ে যেন জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মিশিয়ে জুলেখা জিজ্ঞেস করল—"ওসমান কোথায়?"

"জাহান্নামে—জাহান্নামে—এইবার তোর পালা।"

জুলেখার গর্ব্বোন্নত শির আরও উন্নত হল'—দৃপ্ত গ্রীবায় কি এক ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তীব্র কণ্ঠে বললে—"বাদশা! ওসমান আলির সঙ্গে জাহান্নামে বাস করা হুসেন তোগ্‌লকের সঙ্গে বেহেস্তে বাস করার চাইতে সুখের।"

জুলেখার কথায় ক্ষিপ্ত শার্দ্দূল যেন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল—বজ্র-মুষ্টিতে ছুরিকা উত্তোলিত করে' দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করে' হুসেন শা বললেন—"তবে বেইমানী জাহান্নামেই যা।"

জুলেখার শরীর থেকে কাশ্মিরী শাল খসে পড়ল—সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত দেহে আপনার দুই বক্ষের মাঝখানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' বললে—"হুসেন শা তোমার ছুরি এইখানে পড়ুক—এইখানে যেখানে জীবনে আমি প্রথম প্রণয়-চুম্বন পেয়েছি।"

বাদশার হাতের উত্তোলিত ছুরিকা আর নাম্‌ল না—যেন বাহুর মাংসপেশী সমূহ কাজ করতে অস্বীকার করল—বাদশার দুই চক্ষু নিবদ্ধ হ'ল সেই অসংখ্য দীপাবলী আলোকিত কক্ষে পরিপূর্ণ-যৌবনা বস্ত্র-লেশ-শূণ্যা মহিমাময়ী রমণীর প্রতি—বাদশা যেন মন্ত্রমুগ্ধ।

বাদশার সমস্ত শরীর থর থর থর থর করে' কাঁপতে লাগল—বজ্রমুষ্টি শিথিল হ'য়ে গেল—ছুরিকা হস্তচ্যুত হয়ে খসে পড়ল—হুসেন শা সেইখানে জুলেখা-বানুর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেন—অশ্রু-রুদ্ধ স্বরে যেন জীবন ভিক্ষার মিনতি কণ্ঠে নিয়ে বললেন—"জুলেখা জুলেখা—হৃদয় তোমার যাকে খুসী তাকে দাও—কিন্তু আমাকে—

আমাকে—" বাদশার অর্দ্ধরুদ্ধ স্বর একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল, আর কোন কথা ফুটল না।

সহস্র দীপালোক যেন ধীরে ধীরে ম্লান হ'য়ে উঠল—জুলেখার গর্ব্বদৃপ্ত শির ধীরে ধীরে কাঁধের উপর নুয়ে পড়ল—লুণ্ঠিত বাদশার প্রতি চেয়ে যেন তার চোখ দুটো গভীর একটা বিষাদে ভ'রে উঠল.....

যেন বুঝলে পশু পশুকে জয় করেছে।

১৩ই অক্টোবর
১৯২১ সাল

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গেল মাঘ।

—:*:—

গেল মাঘ, শীত হ'ল শেষ,
গাছপালা সবে খুসী, আমরা বিশেষ,
ছিল তারা উদাসীন, পরণ পিরাণহীন,
আমরা বস্ত্রের বোঝা বয়ে', সয়ে' ক্লেশ!
আজ তারা উড়াইবে ফুলের চাদর,
আবার ফিরিয়া পাবে পাতার আদর,
ছিল তারা মূক হ'য়ে কতকাল দুখ সয়ে',
এবার ঝাড়িবে বুলি কাঁপাইয়া দেশ!

গেলমাঘ পালাইল শীত,
মানসের তীর ছাড়ে মরাল অতিথ
মোদের মানসতীরে পুন গান আসে ফিরে,
স্মৃতির বেদনা যায়, বিরহ বিস্মৃত!
চড়া পঞ্চমেতে বাঁধা সে গানের সুর,
দয়েল, পাপিয়া, পিক যাহে ভরপূর!
সে গানের সহবৎ সাহানার নহবৎ,
কালপর, আজ প্রেমে পরাণ বিস্মিত!

শীত শেষ, মাঘ গেল চলে',
বলে গেল তুলে রাখ সিন্দুকের তলে,
যত শাল জামিয়ার লোই পট্টু-ধুষা আর,
ঘিরে নাও তনুখানি মলয় আঁচলে,
চন্দন সুগন্ধে তারি আসিবে পরাণে,
যে দরদী গান কভু পশে নাই কানে!
ফুলে ফুলে যাবে ছেয়ে, বুঝিবে বারেক চেয়ে
গেরুয়া আগুণ, রাঙা অশোকের দলে!

গেল শীত, ফুরাইল মাঘ,
এইবারে ফুলদোল এইবারে ফাগ!
নিছক নিরাশা শাদা রং মেখে গাদা গাদা,
শিমূলের মত হবে পূরো রক্ত-রাগ!
ফল যার ফেটে যায় আপন আবেগে,
একেবারে ভরে উঠে, ওঠে যবে জেগে!
যায় অতীতের ভয়, আশার আসান হয়,
ফুলের রঙীন নেশা, বীজের সোহাগ!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ফাগুনের সাড়া।

—:০:—

বাতাসে এসেছে ফাগুনের সাড়া,
গাছে গাছে যত পাতা কথা কয়,
বনে প্রান্তরে তাই এত তাড়া,
কার বুকে আগে কত ফুল হয়!

রোদের হাসিটি মধুর মধুর!
হাসে যেন শিশু মার মুখ চেয়ে,
কানে গেছে তার কি গানের সুর,
দুধ গলে' পড়ে রাঙা ঠোঁট বেয়ে!

দুটি কচি দাঁত ভোলা মুখে তার,
কুঁড়ি যেন দুটি পাঁপড়ি খুলেছে,
কি অমিয়া ধারা হিয়ার মাঝার,
সুধা খেতে আজ তাই সে ভুলেছে।

নেবুফুল আর আমের মুকুল,
আগুণ-লাগান অশোক পলাশ,
রঙীন নিশান ওড়ায় শিমুল,
হাসে তিতো নিমে ফুলের বিলাস !

চুপি চুপি অই প্রবাসী মলয়,
পিছু হতে এসে জড়াইয়া ধরে,
সহসা কুসুমে সুরভি সঞ্চয় !
মাধবী-মধুতে বুক ওঠে ভরে' !

কোথা ছিল পিক এল কার ডাকে ?
নাম ধরে কার ডাকিছে পাপিয়া ?
ঘরের আগল আর কেবা রাখে ?
পাগল পরাণ চলে বাহিরিয়া !

খুলে গেল কুঁড়ি, হাসে কিশলয়,
মরা-পাতা সব পড়িয়াছে ঝরে,
বন উতরোল এসেছে মলয়,
অতীত উতলা সে আশার ঝড়ে !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী